প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

স্বামী বিবেকানন্দ

তৃতীয় সংস্করণ।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬।

[মূল্য ।৵৹ আট আনা।

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা।

এই প্রবন্ধটী উদ্বোধন পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহাতে শ্রীমৎ স্বামীজির গভীর মনস্বিতা ও ভূয়োদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। আমাদের সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়; একদলের মতে পাশ্চাত্য যাহা কিছু সবই নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। দেশী জিনিসের মধ্যে আদৌ দেখিবার বা ভাবিবার বিষয় কিছুই নাই। অপর দল ইহার ঠিক বিপরীতমতাবলম্বী; হিন্দুদের এবং হিন্দুসমাজের যে কোন-কিছু দোষের থাকিতে পারে, তাহা একেবারেই অসম্ভব বিবেচনা করেন; আর যে পাশ্চাত্য জাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ সমস্ত পৃথিবীময় আপনার রাজত্ব বিস্তার করিতে বসিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে আমাদের যে কিছু শিখিবার আছে, ইহা তাঁহারা কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। এই প্রবল স্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে হিন্দুসমাজ আত্মহারা হইতে বসিয়াছে। স্বামীজির এই প্রবন্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোত যথার্থ পথে প্রবাহিত করাইয়া দিবে, এই আশা করিয়া বিবেকানন্দ সমিতি হইতে ইহার পুনর্মুদ্রণ করা গেল।

আমরা আশা করি শিক্ষিত বঙ্গবাসীমাত্রেই এই পুস্তকের সমাদর করিবেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ইহার মূল্য যথাসম্ভব কম করা গেল। উদ্বোধনের সত্বাধিকারী মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের

বিজ্ঞাপন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ অনেক দিন নিঃশেষ হইয়াছিল। নানাকারণে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইল। পূর্ব্ববার হইতে এবার ইহার অধিক আদর হইবে, আশা করা যায়।

স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে আমাদের দৃষ্টি নিজ দেশের প্রতি কিছু আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বদেশভক্তির মুলভিত্তি সম্বন্ধে এবং পাশ্চাত্য দেশ হইতেই বা কিরূপে তাহাদের কি কি গুণ গ্রহণ করিলে আমাদের জাতীয় উন্নতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সাধারণের একটা পরিষ্কার ধারণা নাই। কেহ কেহ পাশ্চাত্য জাতির উপর অযথা বিদ্বেষ সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছেন। আশা করি, স্বামীজির এই নিরপেক্ষ সমালোচনা গ্রন্থ দ্বারা লোকশিক্ষার বিশেষ সহায়তা হইবে।

এবার পুস্তকখানি স্বামীজির হস্তলিপির সহিত ভাল করিয়া মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পুস্তক পাঠের সুবিধার জন্য কতকগুলি মার্জ্জিন্যাল নোট এবং ২।৪টী ফুটনোটও সংযুক্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাইকা টাইপে ও উৎকৃষ্ট মোটা এ্যান্টিক কাগজে

ছাপা হইল এবং স্বামীজির একখানি হাফটোন্ চিত্র দেওয়া হইল। এই সকল কারণে ব্যয়াধিক্য হওয়া সত্ত্বেও মূল্য সামান্য মাত্র বৃদ্ধি করা হইল। ইতি—

বশম্বদ

প্রকাশক।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

বর্ত্তমান ভারতের বাহ্য ছবি।

সলিলবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দনবিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্ব্বকারুকার্য্যমণ্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্ম্মরপ্রাসাদ; পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে, ভগ্নমৃণ্ময়প্রাচীর জীর্ণচ্ছাদ দৃষ্টবংশকঙ্কাল কুটীরকুল, ইতস্ততঃ শীর্ণদেহচ্ছিন্নবসন, যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিতবদন নরনারী, বালকবালিকা; মধ্যে মধ্যে সমধর্ম্মী সমশরীর গো, মহিষ, বলীবর্দ্দ; চারিদিকে আবর্জ্জনারাশি—এই আমাদের বর্ত্তমান ভারত।

অট্টালিকাবক্ষে জীর্ণ কুটীর, দেবালয়ক্রোড়ে আবর্জ্জনাস্তূপ, পট্টশাটাবৃতের পার্শ্বচর কৌপীনধারী, বহ্বন্নতৃপ্তের চতুর্দ্দিকে ক্ষুৎক্ষাম জ্যোতির্হীন চক্ষুর কাতর দৃষ্টি—আমাদের জন্মভূমি।

পাশ্চাত্যের প্রাচ্য

বিসূচিকার বিভীষণ আক্রমণ, মহামারীর উৎসাদন, ম্যালেরিয়ার অস্থিমজ্জাচর্ব্বণ, অনশন-অর্দ্ধাশনসহজভাব, মধ্যে মধ্যে মহাকালরূপ দুর্ভিক্ষের মহোৎসব,

রোগ শোকের কুরুক্ষেত্র, আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের কঙ্কাল পরিপ্লুত মহাশ্মশান, তন্মধ্যে ধ্যানমগ্ন মোক্ষপরায়ণ যোগী,—ইউরোপী পর্য্যটক এই দেখে।

ত্রিশংকোটি মানবপ্রায় জীব—বহুশতাব্দী যাবৎ স্বজাতি বিজাতি স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মীর পদভরে নিষ্পীড়িত-প্রাণ, দাসসুলভপরিশ্রমসহিষ্ণু, দাসবৎ উদ্যমহীন, আশাহীন, অতীত-হীন, ভবিষ্যৎ-বিহীন, যেন কেন প্রকারেণ বর্ত্তমান প্রাণধারণমাত্র প্রত্যাশী, দাসোচিত ঈর্ষাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি-অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, শৃগালবৎ নীচচাতুরীপ্রতারণাসহায়, স্বার্থপরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলের যমস্বরূপ, বলহীন আশাহীনের সমুচিত কদর্য্যবিভীষণকুসংস্কারপূর্ণ, নৈতিক-মেরুদণ্ড-হীন, পূতিগন্ধপূর্ণমাংসখণ্ড-ব্যাপী কীটকুলের ন্যায় ভারত-শরীরে পরিব্যাপ্ত—ইংরাজ রাজপুরুষের চক্ষে আমাদের ছবি।

প্রাচ্যের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য।

নববলমধুপানমত্ত, হিতাহিতবোধহীন হিংস্রপশুপ্রায় ভয়ানক, স্ত্রীজিত, কামোন্মত্ত, আপাদমস্তক সুরাসিক্ত, আচারহীন, শৌচহীন, জড়বাদী, জড়সহায়, ছলে বলে কৌশলে পরদেশ-পরধনাপহরণ-পরায়ণ,

পরলোকে বিশ্বাসহীন, দেহাত্মবাদী, দেহপোষণৈক-জীবন ;—ভারতবাসীর চক্ষে পাশ্চাত্য অসুর।

এই ত গেল উভয় পক্ষের বুদ্ধিহীন বহির্দৃষ্টি লোকের কথা। ইউরোপী বিদেশী সুশীতল সুপরিষ্কৃত সৌধশোভিত নগরাংশে বাস করেন, আমাদের "নেটিভ" পাড়াগুলিকে নিজেদের দেশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহরের সঙ্গে তুলনা করেন। ভারতবাসীদের যা সংসর্গ তাঁদের হয়, তা কেবল একদলের লোক—যারা সাহেবের চাকরি করে। আর, দুঃখ দারিদ্র্য ত বাস্তবিক ভারতবর্ষের মত পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ময়লা আবর্জ্জনা চারিদিকে ত পড়েই রয়েছে। ইউরোপী চক্ষে এ ময়লার, এ দাসবৃত্তির, এ নীচতার মধ্যে, যে কিছু ভাল থাকা সম্ভব, তা বিশ্বাস হয় না।

আমরা দেখি, শৌচ করে না, আচমন করে না, যা তা খায়, বাছ-বিচার নাই, মদ খেয়ে মেয়ে বগলে ধেই ধেই নাচ,—এ জাতের মধ্যে কি ভাল রে বাপু।

দুই দৃষ্টিই বহির্দৃষ্টি, ভেতরের কথা বুঝতে পারে না। বিদেশীকে আমরা সমাজে মিশতে দিই না, ম্লেচ্ছ বলি,—ওরাও কালা দাস বলে আমাদের ঘৃণা করে।

এ দুয়ের মধ্যে কিছু সত্য অবশ্যই আছে, কিন্তু দু দলেই ভেতরের আসল জিনিস্ দেখে নি।

প্রত্যেক জাতির জীবনোদ্দেশ্য বিভিন্ন।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র,— ভাষা মাত্র। সেইরূপ, প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য্য কর্‌ছে—সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক। যে দিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, সে দিন সে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ, দারিদ্র্য, ঘরে বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে, আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক। ইউরোপী-দের তেমনি একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা না হলে সংসার চল্‌বে না; তাই ওরা প্রবল। একে-বারে নির্বল হলে কি মানুষ আর বাঁচে? জাতিটা ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র; একেবারে নির্বল নিষ্কর্ম্মা হলে জাতটা কি বাঁচবে? হাজার বৎসরের নানারকম হাঙ্গামায় জাতটা মলো না কেন? আমাদের রীতি নীতি যদি এত খারাপ, ত আমরা এতদিনে উৎসন্ন গেলাম না কেন? বিদেশী বিজেতাদের চেষ্টার ত্রুটি

কি হয়েছে ? তবু সব হিঁদু মরে লোপাট হল না কেন—অন্যান্য অসভ্য দেশে যা হয়েছে ? ভারতের ক্ষেত্র জনমানবহীন হয়ে কেন গেল না, বিদেশীরা তখুনিই ত এসে চাষ বাস করে বাস কর্‌তো, যেমন আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকায় হয়েছে এবং হচ্ছে ? তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান্ নিজেকে ভাব, ওটা কল্পনা ; ভারতেও বল আছে, মাল আছে, এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে, আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি। এটি তোমরাও বেশ করে বোঝ—যাঁরা অন্তর্বহিঃ সাহেব সেজে বসেছ এবং "আমরা নরপশু," "তোমরা, হে ইয়োরোপী লোক, আমাদের উদ্ধার কর," বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ। আর, যীশু এসে ভারতে বসেছেন বলে, হাঁসেন হোঁসেন কর্‌ছ। ওহে বাপু, যীশুও আসেন নি, জিহোবাও আসেন নি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এ দেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁটা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়োশিব ষাঁড় চড়ে, ভারত-

বর্ষ থেকে, একদিকে সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবিস, মায় অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার কিনার পর্য্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছেন, আর একদিকে, তিব্বত, চীন, জাপান, সিবেরিয়া পর্য্যন্ত বুড়োশিব ষাঁড় চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন। ঐ যে মা কালী, উনি চীন, জাপান পর্য্যন্ত পূজা খাচ্ছেন, ওঁকেই যীশুর মা মেরি করে কৃশ্চানরা পূজা করছে। ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখ্‌ছ, ওরির উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়োশিবের প্রধান আড্ডা। ও কৈলাস দশ-মুণ্ড কুড়িহাত রাবণ নাড়াতে পারে নি, ও কি এখন পাদ্রী ফাদ্রীর কর্ম্ম!! ঐ বুড়োশিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন,— এদেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন? তোমাদের দু চার জনের জন্য দেশশুদ্ধ লোককে হাড় জ্বালাতন হতে হবে বুঝি? চরে খাওগে না কেন? এত বড় দুনিয়াটা পড়ে ত রয়েছে। তা নয়। মুরদ কোথায়? ঐ বুড়ো-শিবের অন্ন খাবেন, আর নেমকহারামি কর্ব্বেন, যীশুর জয় গাইবেন—আ মরি!! ঐ যে সাহেবদের কাছে নাকি কান্না ধর যে, "আমরা অতি নীচ, আমরা

অতি অপদার্থ, আমাদের সব খারাপ," এ কথা ঠিক হতে পারে—তোমরা অবশ্য সত্যবাদী; তবে, ঐ "আমরা"র ভেতর দেশশুদ্ধকে জড়াও কেন? ওটা কোনদিশি ভদ্রতা, হে বাপু?

প্রথম বুঝ্‌তে হবে যে, এমন কোনও গুণ নেই, যা কোনও জাতিবিশেষের একাধিকার। তবে, কোনও ব্যক্তিতে যেমন, তেম্‌নি কোনও জাতিতে কোনও কোনও গুণের আধিক্য, প্রাধান্য।

প্রাচ্যের উদ্দেশ্য মুক্তি, পাশ্চাত্যের ধর্ম্ম।

আমাদের দেশে মোক্ষলাভেচ্ছার প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে "ধর্ম্মের"। আমরা চাই কি—"মুক্তি"। ওরা চায় কি—"ধর্ম্ম"। ধর্ম্ম-কথাটা মীমাংসকদের মতে ব্যবহার হচ্ছে। ধর্ম্ম কি? যা ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূল। ধর্ম্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।

মোক্ষ কি? যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই, এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ত এ লোকও নয়, পরলোকও নয়। তবে, সে দাসত্ব—লোহার শিকল আর সোণার শিকল। তার পর প্রকৃতির মধ্যে বলে বিনাশশীল সে সুখ

থাক্‌বে না। অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীর-বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চল্‌বে না। এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই। এই জন্য, ঐ যে কথা শুনেছ যে মুক্ত পুরুষ ভারতেই আছে, অন্যত্র নয়, তা ঠিক। তবে, পরে অন্যত্রও হবে। সে ত আনন্দের বিষয়। এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্ত্তমান ছিলেন। বৌদ্ধদের পর হতে ধর্ম্মটা একেবারে অনাদৃত হল, খালি মোক্ষমার্গ ই প্রধান হল। তাই অগ্নিপুরাণে রূপকচ্ছলে বলেছে যে, গয়াসুর (বুদ্ধ)* সকলকে মোক্ষ-

* গয়াসুর ও বুদ্ধদেবের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে স্বামীজির মত পরে পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি দেহত্যাগের অল্পদিন পূর্ব্বে ৺ কাশীধাম হইতে জনৈক শিষ্যকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে একস্থানে বলিয়াছেন ঃ—

"অগ্নিপুরাণে গয়াসুর সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাহাতে (যেমন ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত) বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য করা হয় নাই, উহা কেবল পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত একটী উপাখ্যান মাত্র।

মার্গ দেখিয়ে জগৎ ধ্বংস কর্‌বার উপক্রম করে-ছিলেন, তাই দেবতারা এসে ছল করে তাঁকে চির-দিনের মত শান্ত করেছিলেন। ফল কথা, এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুন্‌ছো, ওটা ঐ ধর্ম্মের অভাব। যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম্ম অনুশীলন করে, সে ত ভালই; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে। নইলে, খামকা দেশশুদ্ধ লোক মিলে সাধু হল, না এ দিক্, না ও দিক্। যখন বৌদ্ধ-রাজ্যে, এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে। বৌদ্ধ, কৃশ্চান, মুসলমান, জৈন, ওদের একটা ভ্রম যে, সকলের জন্য সেই এক আইন, এক নিয়ম। ঐটি মস্ত ভুল; জাতি, ব্যক্তি, প্রকৃতিভেদে শিক্ষা, ব্যব-হার, নিয়ম, সমস্ত আলাদা, জোর করে এক কর্ত্তে গেলে কি হবে? বৌদ্ধরা বল্‌লে, "মোক্ষের মত আর কি আছে, দুনিয়া শুদ্ধ মুক্তি নেবে চল,"—

ধর্ম্মলোপে ভারতের অবনতি।

বুদ্ধ যে গয়শীর্ষ পর্ব্বতে বাস করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ স্থান পূর্ব্ব হইতেই ছিল, প্রমাণিত হইতেছে।"

[উদ্বোধন—৮ম বর্ষ, ৫৮৮ পৃঃ]

বলি, তা কখনও হয়? "তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ও সব কথায় বেশী আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম্ম কর," এ কথা বল্‌ছেন হিঁদুর শাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই। এক হাত লাফাতে পারে না, লঙ্কা পার হবে। কাযের কথা? দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে এক বুদ্ধি হয়ে, একটা সাধারণ হিতকর কায কর্ত্তে পার না,—মোক্ষ নিতে দৌড়াচ্ছ!! হিঁদুশাস্ত্র বল্‌ছেন যে, "ধর্ম্মের" চেয়ে "মোক্ষটা" অবশ্য অনেক বড়,—কিন্তু আগে ধর্ম্মটি করা চাই। বৌদ্ধরা ঐখানটায় গুলিয়ে যত উৎপাত করে ফেল্‌লে আর কি! অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা, কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বল্‌ছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ কর্‌বে। "আততায়িনং উদ্যন্তং" ইত্যাদি, হত্যা কর্‌তে এসেছে, এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নাই, মনু বল্‌ছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, বীর্য্যপ্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক। আর ঝাটা লাথি খেয়ে,

চুপটি করে, ঘৃণিত জীবন যাপন কর্‌লে, ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য, সত্য, পরমসত্য,—স্বধর্ম্ম কর হে বাপু। অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু, অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তে হবে। মহা উৎসাহে, অর্থোপার্জ্জন করে, স্ত্রী পরিবার দশ-জনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান কর্‌তে হবে। এ না পার্‌লে ত তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও—আবার "মোক্ষ"!!

ধর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, "ধর্ম্ম" হচ্ছে কার্য্যমূলক। ধার্ম্মিকের লক্ষণ হচ্ছে সদা কার্য্যশীলতা। এমন কি, অনেক মীমাংসকের মতে বেদে যে স্থলে কার্য্য কর্‌তে বল্‌ছে না, সে স্থলগুলি বেদই নয়।—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যং অতদর্থানাং" জৈমিনিসূত্র।—"ওঁকার ধ্যানে সর্ব্বার্থসিদ্ধি," "হরিনামে সর্ব্ব পাপনাশ," "শরণাগতের সর্ব্বাপ্তি," এ সমস্ত শাস্ত্র-বাক্য সাধুবাক্য অবশ্য সত্য; কিন্তু, দেখতে পাচ্ছ যে, লাখো লোক ওঁকার জপে মচ্ছে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিনরাত "প্রভু যা করেন" বল্‌ছে, এবং

পাচ্ছে—ঘোঁড়ার ডিম। তার মানে বুঝ্‌তে হবে যে, কার জপ যথার্থ হয়? কার মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ? কে শরণ যথার্থ নিতে পারে? যার কর্ম্ম করে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, অর্থাৎ যে "ধার্ম্মিক"।

প্রত্যেক জীব শক্তিপ্রকাশের এক একটি কেন্দ্র। পূর্ব্বের কর্ম্মফলে সে শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে, আমরা তাই নিয়ে জন্মেছি। যতক্ষণ সে শক্তি কার্য্য-রূপে প্রকাশ না হচ্ছে, ততক্ষণ কে স্থির থাক্‌বে বল? ততক্ষণ, ভোগ কে ঘোচায় বল? তবে দুঃখ ভোগের চেয়ে, সুখভোগটা ভাল নয়? কুকর্ম্মের চেয়ে, সুকর্ম্মটা ভাল নয়? পূজ্যপাদ শ্রীরামপ্রসাদ বলেছেন,—"ভাল মন্দ দুটো কথা, ভালটা তার করাই ভাল"।

মুক্তিকাম ও ধর্ম্মকামের আদর্শের ভিন্নতা।

এখন ভালটা কি? "মুক্তিকামের ভাল" অন্যরূপ, "ধর্ম্মকামের ভাল" আর এক প্রকার। এই গীতা-প্রকাশক শ্রীভগবান্ এত করে বুঝিয়েছেন, এই মহা সত্যের উপর হিঁদুর স্বধর্ম্ম জাতিধর্ম্ম ইত্যাদি।

"নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ" ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য মোক্ষকামের জন্য। আর, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" ইত্যাদি, "তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব,"

ইত্যাদি ধর্ম্মলাভের উপায় ভগবান্ দেখিয়েছেন! অবশ্য, কর্ম্ম কর্‌তে গেলেই, কিছু না কিছু পাপ আস্‌বেই। এলোই বা; উপোষের চেয়ে আধপেটা ভাল নয়? কিছু না করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে, ভালমন্দমিশ্র কর্ম্ম করা ভাল নয়? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না, তবু তারা গরুই থাকে, আর দেয়ালই থাকে। মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়। সত্ত্ব-প্রাধান্য অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরমধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃপ্রাধান্যে ভাল মন্দ ক্রিয়া করে, তমঃ-প্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় জড় হয়। এখন বাইরে থেকে, এই সত্ত্বপ্রধান হয়েছ, কি তমঃপ্রধান হয়েছ, কি করে বুঝি বল? সুখদুঃখের পার ক্রিয়াহীন শান্তরূপ সত্ত্ব অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণহীন, জড়প্রায়, শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন, মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে, চুপ করে ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছি, এ কথার জবাব দাও,—নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। জবাব কি আর দিতে হয়,—"ফলেন পরিচীয়তে"। সত্ত্বপ্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, শান্ত হয়; কিন্তু, সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়, সে শান্তি

মহাবীর্য্যের পিতা। সে মহাপুরুষের আর আমাদের মত হাত পা নেড়ে কায কর্‌তে হয় না, তাঁর ইচ্ছা মাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই পুরুষই সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণ, সর্ব্বলোকপূজ্য; তাঁকে কি আর "পূজা কর" বলে পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়াতে হয়? জগদম্বা তাঁর কপালফলকে নিজের হাতে লিখে দেন যে, এই মহাপুরুষকে সকলে পূজা কর, আর জগৎ অবনত মস্তকে শোনে। সেই মহাপুরুষই "নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ" ইত্যাদি। আর ঐ যে মিন্‌মিনে পিন্‌পিনে ঢোঁক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়ান্যাতা সাত দিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না, ও গুলো হচ্ছে তমোগুণ, ও গুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ। অর্জ্জুন ঐ দলে পড়ছিলেন বলেই ত, ভগবান্ এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায়। প্রথম ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ,"—শেষ, "তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব।" ঐ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে, আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি,—দেশশুদ্ধ পড়ে কতই হরি বল্‌ছি, ভগবান্‌কে ডাক্‌ছি, ভগবান্

শুন্‌ছেনই না, আজ হাজার বৎসর। শুন্‌বেনই বা কেন, আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না,—তা ভগবান্। এখন উপায় হচ্ছে, ঐ ভগবদ্বাক্য শোনা, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ"; "তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব"।

এখন চলুক পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের কথা। প্রথমে একটা তামাসা দেখ। ইউরোপীদের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে, নির্ব্বৈর হও, এক গালে চড় মার্‌লে আর এক গাল পেতে দাও, কায কর্ম্ম বন্ধ কর, পৌটলা পুঁটলি বেঁধে বসে থাক, আমি এই আবার আস্‌ছি, দুনিয়াটা এই দু-চার দিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর, আমাদের ঠাকুর বল্‌ছেন, মহা উৎসাহে সর্ব্বদা কার্য্য কর, শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু "উল্টা সমঝলি রাম" হলো; ওরা, ইউরোপীরা, যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌লে না। সদা মহারজোগুণ, মহাকার্য্যশীল, মহা উৎসাহে দেশদেশান্তরের ভোগসুখ আকর্ষণ করে ভোগ কর্‌ছে। আর, আমরা কোণে বসে, পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে, দিন রাত, মরণের ভাবনা ভাব্‌ছি, "নলিনীদলগতজলমতিতরলং

পাশ্চাত্য জাতি কৃষ্ণের ও প্রাচ্য জাতি যীশুর উপদেশ অনুসরণ করিতেছে।

তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং" গাচ্ছি ; আর যমের ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে। আর পোড়া যমও তাই বাগ্ পেয়েছে, দুনিয়ার রোগ আমাদের দেশে ঢুকেছে। গীতার উপদেশ শুন্‌লে কে ? না— ইউরোপী। আর যীশুকৃষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কায কর্‌ছে কে ? না—কৃষ্ণের বংশধরেরা ! ! এ কথাটা বুঝতে হবে। মোক্ষমার্গ ত প্রথম বেদই উপদেশ করেছেন। তার পর, বুদ্ধই বল, আর যীশুই বল, সব ঐখান থেকেই ত যা কিছু গ্রহণ। আচ্ছা, তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী,—নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ—বেশ কথা, উত্তম কথা। তবে, জোর করে দুনিয়াশুদ্ধকে ঐ মোক্ষ মার্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেন ? ঘসে মেজে রূপ, আর ধরে বেঁধে পিরীত কি হয় ? যে মানুষটা মোক্ষ চায় না, পাবার উপযুক্ত নয়, তার জন্য বুদ্ধ বা যীশু কি উপদেশ করেছেন বল,—কিছুই নয়। হয় তুমি মোক্ষ পাবে বল, নয় তুমি উৎসন্ন যাও, এ দুই কথা। মোক্ষ ছাড়া যা কিছু চেষ্টা করবে, সে আট ঘাট তোমার বন্ধ। তুমি যে এ দুনিয়াটা একটু ভোগ করবে তার কোনও রাস্তা নাই, বরং প্রতিপদে বাধা। কেবল বৈদিক

ধর্ম্মে এই চতুর্ব্বর্গ সাধনের উপায় আছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্ব্বনাশ; যীশু করলেন গ্রীস রোমের সর্ব্বনাশ!!! তার পর, ভাগ্যফলে ইউরোপীগুলো প্রটেষ্টাণ্ট (Protestant) হয়ে, যীশুর ধর্ম্ম ঝেড়ে ফেলে দিলে; হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলো। ভারতবর্ষে কুমারিল্ল ফের কর্ম্মমার্গ চালালেন, শঙ্কর আর রামানুজ চতুর্ব্বর্গের সমন্বয়রূপ সনাতন বৈদিক মত ফের প্রবর্ত্তন কল্লেন, দেশটার বাঁচবার আবার উপায় হল। তবে ভারতবর্ষে ৩০ ক্রোর লোক, দেরি হচ্ছে। ৩০ ক্রোর লোককে চেতানো কি এক দিনে হয়?

বুদ্ধধর্ম্মের আর বৈদিক ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক। তবে বৌদ্ধমতের উপায়টি ঠিক নয়। উপায় যদি ঠিক হত, ত আমাদের এ সর্ব্বনাশ কেন হল? ‘কালেতে হয়’ বল্লে কি চলে? কাল কি, কার্য্য-কারণসম্বন্ধ ছেড়ে, কায কর্ত্তে পারে?

অতএব উদ্দেশ্য এক হলেও, উপায়হীনতায় বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষকে পাতিত করেছে। বৌদ্ধবন্ধুরা চটে যাও, যাবে; ঘরের ভাত বেশী করে খাবে। সত্যটা বলা উচিত। উপায় হচ্ছে বৈদিক উপায়,—

"জাতিধর্ম্ম," "স্বধর্ম্ম," যেটি বৈদিক ধর্ম্মের, বৈদিক সমাজের ভিত্তি। আবার, অনেক বন্ধুকে চটালুম, অনেক বন্ধু বল্‌ছেন যে, এ দেশের লোকের খোসা-মুদি হচ্ছে। একটা কথা তাঁদের জন্য বলে রাখা যে, দেশের লোকের খোসামোদ করে আমার লাভটা কি? না খেতে পেয়ে মরে গেলে দেশের লোকে একমুঠা অন্ন দেয় না; ভিক্ষে শিক্ষে করে, বাইরে থেকে এনে, দুর্ভিক্ষ অনাথকে যদি খাওয়াই, ত তার ভাগ নেবার জন্য দেশের লোকের বিশেষ চেষ্টা, যদি না পায়, ত গালাগালির চোটে অস্থির!! হে স্বদেশি-পণ্ডিতমণ্ডলি! এই ত আমার দেশের লোক, তাদের আবার কি খোসামোদ? তবে তারা উন্মাদ হয়েছে, উন্মাদকে যে ঔষধ খাওয়াতে যাবে, তার হাতে দু দশটা কামড় অবশ্যই উন্মাদ দেবে; তা সয়ে যে ঔষধ খাওয়াতে যায়, সেই যথার্থ বন্ধু। এই "জাতিধর্ম্ম," "স্বধর্ম্মই" সকল দেশে সামাজিক কল্যাণের উপায়, মুক্তির সোপান। ঐ "জাতিধর্ম্ম," "স্বধর্ম্ম" নাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশটার অধঃপতন হয়েছে। তবে নিধুরাম সিধুরাম যা জাতিধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম বলে বুঝছেন, ওটা উল্টো উৎপাত; নিধু জাতি-

স্বধর্ম্ম রক্ষাই জাতীয় কল্যাণের উপায়।

ধর্ম্মের ঘোঁড়ার ডিম বুঝছেন, ওঁর গাঁয়ের আচারকেই সনাতন আচার বলে ধারণা কচ্ছেন, নিজের কোলে ঝোল টানছেন, আর উৎসন্ন যাচ্ছেন। আমি গুণগত জাতির কথা বল্‌ছি না, বংশগত জাতির কথা বল্‌ছি, জন্মগত জাতির কথা বল্‌ছি। গুণগত জাতিই আদি, স্বীকার করি; কিন্তু, গুণ দু চার পুরুষে বংশগত হয়ে দাঁড়ায়। সেই আসল জায়গায় ঘা পড়েছে, নইলে সর্ব্বনাশ হল কেন? "সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।" কেমন করে এ ঘোর বর্ণসাঙ্কর্য্য উপস্থিত হলো, সাদা রং কাল কেন হল, সত্ত্বগুণ, রজোগুণপ্রধান—তমোগুণে কেন উপস্থিত হল, সে সব অনেক কথা, বারান্তরে বল্‌বার রইল। আপাততঃ এইটি বোঝ যে, জাতিধর্ম্ম যদি ঠিক ঠিক থাকে, ত সে দেশের অধঃপতন হবেই না। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে আমাদের অধঃপতন কেন হল? অবশ্যই জাতিধর্ম্ম উৎসন্নে গেছে। অতএব, যাকে তোমরা জাতিধর্ম্ম বোল্‌ছো, সেটা ঠিক উল্টো। প্রথম, পুরাণ পুঁথি পাটা বেশ করে পড়গে, এখুনিই দেখতে পাবে যে, শাস্ত্রে যাকে জাতিধর্ম্ম বল্‌ছে, তা সর্ব্বত্রই প্রায় লোপ হয়েছে। তার পর, কিসে

সেইটি ফের আসে, তারি চেষ্টা কর; তা হলেই পরম কল্যাণ নিশ্চিত। আমি যা শিখেছি, যা বুঝেছি, তাই তোমাদের বল্‌ছি; আমি ত আর বিদেশ থেকে, তোমাদের হিতের জন্য আমদানী হইনি যে, তোমাদের আহাম্মকি গুলিকে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হবে? বিদেশী বন্ধুর কি? বাহবা লাভ হলেই হলো। তোমাদের মুখে চুণকালী পড়লে যে, আমার মুখে পড়ে,—তার কি?

জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তিতে আঘাত পড়িলেই বিপ্লব বা জাতীয় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষ-দের প্রতিভাবলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতি নীতি, সেই উদ্দেশ্যটি সফল কর্‌বার উপযোগী হয়ে গড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতির জীবনে ঐ উদ্দেশ্যটী এবং তদুপযোগী উপায়রূপ আচার ছাড়া, আর সমস্ত রীতি নীতিই বাড়ার ভাগ। এই বাড়ার ভাগ রীতি নীতি গুলির হ্রাস বৃদ্ধিতে বড় বেশী এসে যায় না; কিন্তু যদি সেই আসল উদ্দেশ্যটিতে ঘা পড়ে, তখুনি সে জাতির নাশ হয়ে যাবে।

ছেলেবেলায় গল্প শুনেছ যে, রাক্ষুসীর প্রাণ একটা পাখীর মধ্যে ছিল। সে পাখীটার নাশ না হলে,

রাক্ষুসীর কিছুতেই নাশ হয় না; এও তাই। আবার দেখ্‌বে যে, যে অধিকারগুলো জাতীয় জীবনের জন্য একান্ত আবশ্যক নয়, সে অধিকার গুলো সব যাক্ না, সে জাতি বড় তাতে আপত্তি করে না; কিন্তু, যখন যথার্থ জাতীয় জীবনে ঘা পড়ে, তৎক্ষণাৎ মহাবলে প্রতিঘাত করে।

ফরাসী, ইংরাজ ও হিন্দুর দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত তত্ত্ব সমর্থন।

তিনটি বর্ত্তমান জাতির তুলনা কর, যাদের ইতিহাস তোমরা অল্পবিস্তর জান,—ফরাসী, ইংরেজ, হিন্দু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসীজাতিচরিত্রের মেরুদণ্ড। প্রজারা সব অত্যাচার অবাধে সয়; করভারে পিষে দাও, কথা নেই; দেশশুদ্ধকে টেনে নিয়ে জোর করে সেপাই কর, আপত্তি নাই; কিন্তু, যেই সে স্বাধীনতার উপর হাত কেউ দিয়েছে, অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদবৎ প্রতিঘাত কর্‌বে। কেউ কারুর উপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পাবে না, এইটিই ফরাসী চরিত্রের মূলমন্ত্র। 'জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ বংশ, নীচ বংশ, রাজ্য শাসনে সামাজিক স্বাধীনতায় আমাদের সমান অধিকার।' এর উপর হাত কেউ দিতে গেলেই তাঁকে ভুগতে হবে।

ইংরাজ চরিত্রে, ব্যবসাবুদ্ধি আদান প্রদান, প্রধান;

যথাভাগ ন্যায়বিভাগ, ইংরাজের আসল কথা। রাজা, কুলীনজাতি-অধিকার, ইংরেজ ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করে; কেবল যদি গাঁট থেকে পয়সাটি বার কর্ত্তে হয়, ত তার হিসাব চাইবে। রাজা আছে, বেশ কথা,—মান্য করি, কিন্তু টাকাটি যদি তুমি চাও, ত তার কার্য্য কারণ, হিসাব পত্রে, আমি দু কথা বলবো বুঝ্‌বো, তবে দিব। রাজা জোর করে টাকা আদায় কর্ত্তে গিয়ে মহাবিপ্লব উপস্থিত করালেন; রাজাকে মেরে ফেল্‌লে।

হিন্দু বল্‌ছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিস হচ্চে পারমার্থিক স্বাধীনতা,—"মুক্তি"। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য; বৈদিক বল, জৈন বল, বৌদ্ধ বল, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত যা কিছু বল, সব ঐখানে এক মত। ঐখানটায় হাত দিও না, তা হলেই সর্ব্বনাশ; তা ছাড়া যা কর চুপ করে আছি। লাথি মার, কাল বল, সর্ব্বস্ব কেড়ে লও, বড় এসে যাচ্ছে না; কিন্তু ঐ দোরটা ছেড়ে রাখ। এই দেখ বর্ত্তমানকালে পাঠানবংশরা আস্‌ছিল, যাচ্ছিল, কেউ সুস্থির হয়ে রাজ্য কর্ত্তে পাচ্ছিল না; কেন না, ঐ

হিঁদুর ধর্ম্মে ক্রমাগত আঘাত কচ্ছিল। আর মোগল রাজ্য কেমন সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠ, কেমন মহাবল হল। কেন? না মোগলরা ঐ যায়গাটায় ঘা দেয়নি। হিঁদুরাই ত মোগলের সিংহাসনের ভিত্তি; জাহাঙ্গীর, সাজাহান্, দারাসেকো, এদের সকলের মা যে হিঁদু। আর দেখ, যেই পোড়া আরঙ্গজেব আবার ঐখানটায় ঘা দিলে, অম্‌নি এত বড় মোগল রাজ্য স্বপ্নের ন্যায় উড়ে গেল। ঐ যে ইংরাজের সুদৃঢ় সিংহাসন, এ কিসের উপর? ঐ ধর্ম্মে হাত কিছুতেই দেয় না বলে। পাদরী-পুঙ্গবেরা একটু আদটু চেষ্টা করেই ত, '৫৭ সালের হাঙ্গাম উপস্থিত করেছিল। ইংরাজরা যতক্ষণ এইটী বেশ করে বুঝবে এবং পালন কর্‌বে, ততক্ষণ ওদের "তকত তাজ অচল রাজধানী"। বিজ্ঞ বহুদর্শী ইংরাজেরাও এ কথা বোঝে, লর্ড রবার্টসের 'ভারতবর্ষে ৪১ বৎসর' নামক পুস্তক পড়ে দেখ। *

এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছ ত, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখীটি কোথায়? ধর্ম্মে। সেইটির নাশ কেউ কর্ত্তে পারেনি বলেই, জাতটা এত সয়ে, এখনও বেঁচে আছে।

---

* Forty one years in India—৩০ ও ৩১ অধ্যায়।

আচ্ছা, একজন দেশী পণ্ডিত বল্‌ছেন যে, ওখানটায় প্রাণটা রাখ্‌বার এত আবশ্যক কি? সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতায় রাখনা কেন?—যেমন অন্যান্য অনেক দেশে। কথাটি ত হল সোজা; যদি তর্কচ্ছলে স্বীকার করা যায় যে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব মিথ্যা, তা হলেও কি দাঁড়ায় দেখ। অগ্নি ত এক, প্রকাশ বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য সুবিচার বিস্তার, আর হিঁদুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছারূপে বিকাশ হয়েছে। কিন্তু, এই মহাশক্তির প্রেরণায় শতাব্দী কতক নানা সুখ দুঃখের ভেতর দিয়ে, ফরাসী বা ইংরেজ চরিত্র গড়ে গেছে এবং তাঁরি প্রেরণায় লক্ষ শতাব্দীর আবর্ত্তনে হিঁদুর জাতীয় চরিত্রের বিকাশ। বলি, আমাদের লাখো বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা, না তোমার বিদেশীর দু পাঁচশ বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা? ইংরেজ কেন ধর্ম্মপ্রাণ হক্ না, মারামারি কাটাকাটিগুলো ভুলে শান্ত শিষ্টটি হয়ে বসুক্ না?

আসল কথা হচ্ছে যে, নদীটা পাহাড় থেকে ১০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একান্ত

করে, ত ইদিক উদিকে ছাড়িয়ে পড়ে মারা যাবে, এই মাত্র। সে নদী যেমন করে হক্, সমুদ্রে যাবেই, দু দিন আগে বা পরে, দুটো ভাল যায়গার মধ্য দিয়ে, না হয় দু একবার আঁস্তাকুড় ভেদ করে। যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে ত, আর ত এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়্‌তে গেলেই মরে যাবে বই ত নয়।

ধর্ম্ম ব্যতীত অপর কিছুতে ভারতের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

কিন্তু, এ বুদ্ধিটি আগা পাস্তলা ভুল; মাপ করো, অল্পদর্শীর কথা। দেশে দেশে আগে যাও, এবং অনেক দেশের অবস্থা বেশ করে দেখ, নিজের চোখে দেখ, পরের চোখে নয়, তারপর যদি মাথা থাকে ত ঘামাও, তার উপর নিজেদের পুরাণ পুঁথি পাটা পড়, ভারতবর্ষের দেশদেশান্তর বেশ করে দেখ, বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতের চোখে দেখ, খাজা আহাম্মকের চক্ষে নয়, সব দেখ্‌তে পাবে যে, জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধ্বক্ ধ্বক্ কর্‌ছে, ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র। আর দেখ্‌বে যে, এ দেশের প্রাণ ধর্ম্ম, ভাষা ধর্ম্ম, ভাব ধর্ম্ম;—আর তোমার রাজ-নীতি, সমাজনীতি, রাস্তাঝেঁটান, প্লেগ নিবারণ,

দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এ সব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে, তাই হবে, অর্থাৎ ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে হয় ত হবে; নইলে ঘোঁড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র!

তা ছাড়া উপায় ত সব দেশেই সেই এক, অর্থাৎ গোটাকতক শক্তিমান্ পুরুষ যা কর্‌ছে, তাই হচ্ছে; বাকি গুলো খালি "ভেড়িয়া ধসন্" * বই ত নয়। ও তোমার "পার্লেমেণ্ট" দেখ্‌লুম, "সেনেট্" দেখ্‌লুম, ভোট্, ব্যালট্, মেজরিটি, সব দেখ্‌লুম, রামচন্দ্র; সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান্ পুরুষরা যে দিকে ইচ্ছে, সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলা ভেড়ার দল। তবে ভারতবর্ষে শক্তিমান্ পুরুষ কে? না ধর্ম্মবীর। তাঁরা আমাদের সমাজকে চালান। তাঁরাই সমাজের রীতি নীতি বদ্‌লাবার দরকার হলে, বদ্‌লে দেন। আমরা চুপ করে শুনি, আর করি। তবে এতে তোমার বাড়ার ভাগ, ঐ মেজরিটি ভোট্ প্রভৃতি হাঙ্গামগুলো নেই, এই মাত্র।

শক্তিমান্ পুরুষই সকল সমাজের পরিচালক।

---

* স্থায়শাস্ত্রে যাহাকে "গড্ডলিকা প্রবাহ" বলে। যেমন একটী মেষের অনুকরণে অপর মেষসমূহ তদনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অবশ্য ভোট ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের যে একটা শিক্ষা হয়, সেটা আমরা পাই না; কিন্তু, রাজনীতির নামে যে চোরের দল, দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে নাই। সে ঘুষের ধূম, সে দিনে ডাকাতি যা পাশ্চাত্য দেশে হয়, রামচন্দ্র! যদি ভেতরের কথা দেখ্‌তে, ত মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে। "গোরস্ গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠ্ বিকায়," "সতীকো না মিলে ধুতি, কস্‌বিন্ পেহনে খাসা।" যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুটোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠ্‌ছে, শুষ্‌ছে, তার পর সেপাই করে দেশদেশান্তরে মর্‌তে পাঠাচ্ছে,—জিত হলে, তাঁদের ঘর ভরে ধনধান্য আস্‌বে। আর প্রজাগুলো ত সেই খানেই মারা গেল,—হে রাম! চম্‌কে যেও না, ভাঁওতায় ভুল না।

পাশ্চাত্য দেশে রাজনীতির নামে দিনে ডাকাতি।

একটা কথা বুঝে দেখ। মানুষে আইন করে, না আইনে মানুষ করে? মানুষে টাকা উপায় করে, না টাকা মানুষ কর্‌তে পারে? মানুষে নাম যশ করে, না নাম যশে মানুষ করে?

মানুষ হও, রামচন্দ্র ! অমনি দেখ্‌বে, ওসব বাকি আপনা আপনি গড়গড়িয়ে আস্‌ছে। ও পরস্পরের নেড়িকুত্তোর খেয়োখেয়ী ছেড়ে, সদুদ্দেশ্য, সদুপায়, সৎসাহস, সদ্বীর্য্য অবলম্বন কর। যদি জন্মেছ, ত একটা দাগ রেখে যাও। "তুলসী যব জগমে আয়ো জগ হসে তোম্‌ রোয়, এ্যায়সে করনি কর চলো কি তোম্‌ হসে জগ রোয়।" যখন তুমি জন্মেছিলে, তুলসি, সকলে হাঁসতে লাগ্‌লো, তুমি কাঁদতে লাগ্‌লে; এখন এমন কায করে চল যে, তুমি হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে মর্‌বে, আর জগৎ তোমার জন্য কাঁদ্‌বে। এ পার, তবে তুমি মানুষ, নইলে কিসের তুমি ?

মানুষ হও।

আর এক কথা বোঝ দাদা,—অবশ্য আমাদের অন্যান্য জাতের কাছে অনেক শেখবার আছে। যে মানুষটা বলে, আমার শেখবার নেই, সে মর্‌তে বসেছে; যে জাতটে বলে, আমরা সবজান্তা, সে জাতের অবনতির দিন অতি নিকট ! "যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।" তবে দেখ, জিনিস্‌টে আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এই মাত্র। আর, আসলটা সর্ব্বদা বাঁচিয়ে, বাকি জিনিস্‌ শিখ্‌তে হবে। বলি, খাওয়া ত সব দেশেই এক; তবে, আমরা পা

পাশ্চাত্য জাতির গুণ সকল আমাদের ছাঁচে ফেলিয়া লইতে হইবে।

গুটিয়ে বসে খাই, বিলাতিরা পা ঝুলিয়ে বসে খায়। এখন মনে কর যে, আমি এদের রকমে রান্না খাওয়া খাচ্ছি; তা বলে কি এদের মত ঠ্যাং ঝুলিয়ে থাক্‌তে হবে? আমার ঠ্যাং যে যমের বাড়ী যাবার দাখিলে পড়ে—টন্‌টনানিতে যে প্রাণ যায়, তার কি? কাযেই পা গুটিয়ে এদের খাওয়া খাব বৈকি। ঐ রকম বিদেশী যা কিছু শিখ্‌তে হবে, সেটা আমাদের মত করে,—পা গুটিয়ে, আসল জাতীয় চরিত্রটী বজায় রেখে। বলি, কাপড়ে কি মানুষ হয়, না মানুষে কাপড় পরে? শক্তিমান্ পুরুষ যে পোষাকই পরুক না কেন, লোকে মানে; আর, আমার মত আহাম্মক ধোপার বস্তা ঘাড়ে করে বেড়ালেও লোকে গ্রাহ্য করে না।

এখন, গৌরচন্দ্রিকাটা বড্ড বড় হয়ে পড়্‌লো; তবে দুদেশ তুলনা করা সোজা হবে, এই ভণিতার পর। এরাও ভাল,—আমরাও ভাল, "কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দুয়ো পাল্লা ভারি।" তবে, ভালর রকমারি আছে, এই মাত্র।

মানুষের মধ্যে আছেন, আমাদের মতে, তিনটা জিনিস্। শরীর আছেন, মন আছেন, আত্মা আছেন।

প্রথম, শরীরের কথা দেখা যাক্, যা সকলকার চেয়ে বাইরের জিনিস্।

শরীরে শরীরে কত ভেদ, প্রথম দেখ। নাক, মুখ, গড়ন, লম্বাই, চৌড়াই, রঙ্গ, চুল, কত রকমের তফাৎ।

বর্ণভেদের কারণ।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে রঙ্গের তফাৎ বর্ণসাঙ্কর্য্যে উপস্থিত হয়। গরম দেশ, ঠাণ্ডা দেশ ভেদে, কিছু পরিবর্ত্তন অবশ্য হয়; কিন্তু, কাল সাদার আসল কারণ, পৈতৃক। অতি শীতল দেশেও ময়লারঙ্গ জাতি দেখা যাচ্ছে, এবং, অতি উষ্ণ দেশেও ধপ্‌ধপে ফর্‌সা জাতি বাস্ কর্‌ছে। কানাডানিবাসী আমেরিকার আদিম মানুষ ও উত্তরমেরুসন্নিহিতদেশনিবাসী এস্কুইমো প্রভৃতি খুব ময়লা রঙ্গ, আবার মহাবিষুবরেখার উপরিস্থিত দ্বীপেও সাদারঙ্গ আদিম জাতির বাস; বোর্ণিও, সেলিবিস্ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ ইহার নিদর্শন।

আর্য্যজাতি।

এখন আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে, হিঁদুর ভেতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাত, এবং চীন, হূন, দরদ, পহ্লব, যবন এবং খশ, এই সকল ভারতের বহিঃস্থিত জাতি, এরা হচ্ছেন আর্য্য।

শাস্ত্রোক্ত চীন জাতি এ বর্ত্তমান 'চীনেম্যান' নয়; ওরা ত সে কালে নিজেদের 'চীনে' বল্‌তই না। 'চীন' বলে এক বড় জাত কাশ্মীরের উত্তরপূর্ব্বভাগে ছিল; দরদ্‌রাও, যেখানে এখন ভারত আর আফ্‌গানের মধ্যে পাহাড়ি জাত সকল, ঐ খানে ছিল। প্রাচীন চীন জাতির দু দশটা বংশধর এখনও আছে। দরদিস্থান এখনও বিদ্যমান। রাজতরঙ্গিনী নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে বারম্বার দরদ্‌রাজের প্রভুতার পরিচয় পাওয়া যায়। হূন নামক প্রাচীন জাতি অনেকদিন ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাংশে রাজত্ব করেছিল। এখন টিবেটিরা নিজেদের হূন বলে; কিন্তু, সেটা বোধ হয়, "হিউন"। ফল, মনূক্ত হূন আধুনিক তিব্বতী ত নয়; তবে, এমন হতে পারে যে, সেই আর্য্য হূন এবং মধ্য-আসিয়া হতে সমাগত কোন মোগলাই জাতির সংমিশ্রণে, বর্ত্তমান তিব্বতীর উৎপত্তি। প্রজাবলস্কি এবং ড্যুক্‌ড অর্‌লিআঁ নামক রূষ ও ফরাসী পর্য্যটকদের মতে, তিব্বতের স্থানে স্থানে এখনও আর্য্য-মুখ-চোখ-বিশিষ্ট জাতি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যবন হচ্ছে গ্রীকদের নাম। এই নামটার উপর অনেক বিবাদ হয়ে গেছে। অনেকের

মতে, যবন এই নামটা 'য়োনিয়া' নামক স্থানবাসী গ্রীকদের উপর প্রথম ব্যবহার হয়; এজন্য মহারাজা অশোকের পালিলেখে 'যোন' নামে গ্রীকজাতি অভিহিত। পরে 'যোন' হতে সংস্কৃত যবন শব্দের উৎপত্তি। আমাদের দিশি কোনও কোনও প্রত্নতত্ত্ব-বিদের মতে যবনশব্দ গ্রীকবাচী নয়। কিন্তু এ সমস্তই ভুল। যবন শব্দই আদি শব্দ, কারণ স্নধু যে হিঁদুরাই গ্রীক্‌দের যবন বল্‌ত, তা নয়; প্রাচীন মিসরি ও বাবিলরাও গ্রীক্‌দের যবন নামে আখ্যাত করত্‌। পহ্লব শব্দে, পেহলবি ভাষাবাদী প্রাচীন পারসী জাতি। খশ শব্দে এখনও অর্দ্ধ সভ্য পার্ব্বত্যদেশবাসী আর্য্যজাতি; এখনও হিমালয়ে ঐ নাম ঐ অর্থে ব্যবহার হয়। বর্ত্তমান ইউরোপীরাও এই অর্থে খশদের বংশধর। অর্থাৎ যে সকল আর্য্য-জাতিরা প্রাচীন কালে অসভ্য অবস্থায় ছিল, তারা সব খশ।

আর্য্যজাতির গঠন ও বর্ণ।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে আর্য্যদের লাল্‌চে সাদা রঙ্গ, কাল বা লাল চুল, সোজা নাক চোক ইত্যাদি; এবং মাথার গড়ন, চুলের রঙ্গ ভেদে, একটু তফাৎ। যেখানে রঙ্গ কাল, সেখানে অন্যান্য কাল জাতের

সঙ্গে মিশে এইটি দাঁড়িয়েছে। এদের মতে হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তস্থিত দু চার জাতি এখনও পূরো আর্য্য আছে, বাকি সমস্ত খিচুড়িজাত; নইলে কাল কেন হল? কিন্তু, ইউরোপী পণ্ডিতদের এখনও ভাবা উচিত যে, দক্ষিণ ভারতেও অনেক শিশু লালচুল জন্মায়, কিন্তু দু চার বৎসরেই চুল ফের কাল হয়ে যায় এবং হিমালয়ে অনেক লাল চুল, নীল বা কটা চোখ।

হিন্দু ও আর্য্য।

এখন পণ্ডিতেরা লড়ে মরুন। আর্য্য নাম হিঁদুরাই নিজেদের উপর চিরকাল ব্যবহার করেছে। শুদ্ধ হোক, মিশ্র হোক, হিঁদুদের নাম আর্য্য, বস। কাল বলে ঘৃণা হয়, ইউরোপীরা অন্য নাম লিন্‌গে। আমাদের তায় কি?

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মোটামুটি প্রভেদ।

কিন্তু কাল হোক, গোরা হোক, দুনিয়ার সব জাতের চেয়ে এই হিঁদুর জাত সুশ্রী, সুন্দর। একথা আমি নিজের জাতের বড়াই করে বল্‌ছি না, কিন্তু একথা জগৎপ্রসিদ্ধ। শতকরা সুশ্রী নরনারীর সংখ্যা এদেশের মত আর কোথায়? তার উপর ভেবে দেখ, অন্যান্য দেশে সুশ্রী হতে যা লাগে, আমাদের দেশে তার চেয়ে ঢের বেশী; কেন না,

হিন্দু সুশ্রী, ইউরোপীয় সুস্থকায়।

আমাদের শরীর অধিকাংশই খোলা। অন্য দেশে কাপড় চোপড় ঢেকে, বিশ্রীকে ক্রমাগত সুশ্রী কর্‌বার চেষ্টা। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্যেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক সুখী। এ সব দেশে ৪০ বৎসরের পুরুষকে জোয়ান বলে, ছোঁড়া বলে, ৫০ বৎসরের স্ত্রীলোক যুবতী। অবশ্য এরা ভাল খায়, ভাল পরে, দেশ ভাল, এবং সর্ব্বাপেক্ষা আসল কথা হচ্ছে, অল্প বয়সে বে করে না। আমাদের দেশেও যে দু একটা বলবান্ জাতি আছে, তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখ, কত বয়সে বে করে। গোর্‌খা, পাঞ্জাবী, জাঠ, আফ্রিদি প্রভৃতি পার্ব্বত্যদের জিজ্ঞাসা কর। তারপর, শাস্ত্র পড়ে দেখ,—৩০, ২৫, ২০,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বেব বয়স। আয়ু বল বীর্য্য, এদের আর আমাদের, অনেক ভেদ; আমাদের বল, বুদ্ধি, ভরসা, তিন পেরুলেই ফরসা; এরা তখন সবে গা ঝেড়ে উঠ্‌ছে। আমরা নিরামিষাশী, আমাদের অধিকাংশ রোগ পেটে; উদরভঙ্গে বুড়োবুড়ী মরে। এরা মাংসাশী, এদের অধিক রোগই বুকে। হৃদ্রোগে, ফুসফুস্ রোগে, এদের বুড়োবুড়ি মরে। একজন এদেশী বিজ্ঞ ডাক্তার-বন্ধু জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন যে,

আমাদের মৃত্যু অধিকাংশ উদর-রোগে, উহাদের হৃদ্রোগে।

পেটের রোগগ্রস্ত লোকেরা প্রায় নিরুৎসাহ বৈরাগ্যবান্ হয়। হৃদয়াদি উপরের শরীরের রোগে, আশা বিশ্বাস পূরো থাকে। ওলাউঠা রুগী গোড়া থেকেই মৃত্যুভয়ে অস্থির হয়। যক্ষ্মারুগী মরবার সময় পর্য্যন্ত বিশ্বাস রাখে যে, সে সেরে উঠ্‌বে। অতএব সেই জন্যেই কি, ভারতের লোক সর্ব্বদাই মরণ মরণ আর বৈরাগ্য বৈরাগ্য কর্‌ছে? আমি ত এখনও উত্তর দিতে পারি নাই; কিন্তু কথাটা ভাববার বটে। আমাদের দেশে দাঁতের রোগ, চুলের রোগ, খুব কম। এ সব দেশে অতি অল্প লোকেরই নিজের স্বাভাবিক দাঁত, আর টাকের ছড়াছড়ি। আমরা নাক ফুড়ছি, কান ফুড়ছি, গহনা পরবার জন্য। এরা এখন, ভদ্রলোকে, বড় নাক কাণ ফোড়ে না; কিন্তু কোমর বেঁধে বেঁধে, শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে, পীলে যকৃৎকে স্থানভ্রষ্ট করে শরীরটাকে বিশ্রী করে বসে। গড়ন গড়ন করে এরা মরে, তায় ঐ বস্তাবন্দি কাপড়ের উপর গড়ন রাখ্‌তে হবে। এদের পোষাক—কাষ কর্ম্ম কর্‌বার অত্যন্ত উপযোগী; ধনী লোকের স্ত্রীদের সামাজিক পোষাক ছাড়া মেয়েদের পোষাকও হতচ্ছাড়া। আমাদের মেয়েদের শাড়ী, আর পুরুষ-

দের চোগা চাপকান পাগড়ীর সৌন্দর্য্যের এ পৃথিবীতে তুলনা নেই। ভাঁজ ভাঁজ পোষাকে যত রূপ, তত আঁটাসাঁটায় হয় না। আমাদের পোষাক সমস্তই ভাঁজ ভাঁজ, কিন্তু আমাদের কায কর্ম্মের পোষাক নেই; কায কর্ত্তে গেলেই কাপড় চোপড় বিসর্জ্জন যায়। এদের ফ্যাসান্ কাপড়ে, আমাদের ফ্যাসান্ গয়নায়; এখন কিছু কিছু কাপড়েও হচ্ছে।

পোষাক।

ফ্যাসান্টা কি, না—ঢঙ্গ; মেয়েদের কাপড়ের ঢঙ্গ—পারিস্ সহর থেকে বেরোয়, পুরুষদের—লণ্ডন থেকে। আগে পারিসের নর্ত্তকীরা এই ঢঙ্গ ফেরাত। একজন বিখ্যাত নটী যা পোষাক পোরলে, সকলে অমনি দৌড়ুল তাই কর্ত্তে। এখন দোকানিরা ঢঙ্গ করে। কত ক্রোর টাকা যে, এই পোষাক কর্ত্তে লাগে প্রতি বৎসর, তাহা আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। এ পোষাক গড়া এক প্রকাণ্ড বিদ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন্ মেয়ের গায়ের, চুলের রঙ্গের সঙ্গে, কোন্ রঙ্গের কাপড় সাজন্ত হবে; কার শরীরের কোন্ গড়নটা ঢাকতে হবে, কোন্টা বা পরিস্ফুট করতে হবে, ইত্যাদি অনেক মাথা ঘামিয়ে পোষাক তৈরি হয়। তারপর, দু চার জন উচ্চপদস্থ মহিলা যা

করেন, বাকি সকলকে তাই পর্‌তে হয়,—না পর্‌লে জাত যায়!! এর নাম ফ্যাসান্‌। আবার, এই ফ্যাসান্‌ ঘড়ি ঘড়ি বদলাচ্ছে; বছরে চার ঋতুতে চার বার বদ্‌লাবেই ত, তা ছাড়া অন্য সময়েও আছে। যারা বড় মানুষ, তারা দরজি দিয়ে পোষাক করিয়ে নেয়; যারা মধ্যবিৎ ভদ্রলোক, তারা কতক নিজের হাতে, কতক ছুট্‌কো ছাট্‌কা মেয়ে দরজি দিয়ে, নূতন ধরণের পোষাক গড়িয়ে নেয়। পরবর্ত্তী ফ্যাসান্‌ যদি কাছাকাছি রকমের হয়, ত পুরাণ কাপড় বদ্‌লে সদ্‌লে নেয়, নতুবা নূতন কেনে। বড় মানুষরা ফি ঋতুতে কাপড়গুলি চাকর বাকরদের দান করে। মধ্যবিত্তেরা বেচে ফেলে; তখন সে কাপড়গুলি ইয়োরোপী লোকদের যে সমস্ত উপনিবেশ আছে,— আফ্রিকা, এসিয়া, অষ্ট্রেলিয়ায়,—সেথায় গিয়ে হাজির হয় এবং তারা পরে। যারা খুব ধনী, তাদের কাপড় পারিস্‌ হতে তৈয়ার হয়ে আসে; বাকিরা নিজেদের দেশে সেগুলি নকল করে পরে। কিন্তু, মেয়েদের টুপিটী আসল ফরাসী হওয়া চাইই চাই। যার তা নয়, সে লেডি নয়। ইংরেজের মেয়েদের আর জর্ম্মাণ মেয়েদের পোষাক বড় খারাপ; ওরা বড় পারিস্‌-

ঢঙ্গে পোষাক পরে না—দু দশজন বড়মানুষ ছাড়া ; এই জন্য অন্যান্য দেশের মেয়েরা ওদের ঠাট্টা করে। ইংরেজ পুরুষরা কিন্তু খুব ভাল পোষাক পরে,—অনেকেই। আমেরিকার মেয়ে পুরুষ সকলেই খুব ঢঙ্গসই পোষাক পরে। যদিও আমেরিকান্ গবর্ণমেণ্ট পারিস্ বা লণ্ডনের আমদানী পোষাকের উপর খুব মাশুল বসায়, যাতে বিদেশী মাল এ দেশে না আসে ; তথাপি এরা মাশুল দিয়েও, মেয়েরা পারিস্ ও পুরুষরা লণ্ডনের তৈরি পোষাক পরে। নানা রকমের, নানা রঙ্গের পশমিনা, বনাত, রেশমী কাপড় রোজ রোজ বেরুচ্ছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাইতে লেগে আছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাই কেটে ছেঁটে পোষাক কর্‌ছে। ঠিক ঢঙ্গের পোষাক না হলে, জেণ্টলম্যান্ বা লেডীর রাস্তায় বেরুনই মুস্কিল। আমাদের দেশে এ ফ্যাসা-নের হাঙ্গাম কিছু কিছু গহনায় ঢুক্‌ছে। এ সব দেশের পশম-রেশম-তাঁতিদের নজর দিন রাত—কি বদ্‌লাচ্ছে বা না বদ্‌লাচ্ছে—লোকে কি রকম পসন্দ কর্‌ছে—তার উপর, অথবা, নূতন একটা করে লোকের মন আকর্ষণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। এক-বার আন্দাজ লেগে গেলেই, সে ব্যবসাদার বড়মানুষ ;

যখন তৃতীয় নেপ্‌লেঅঁ ফরাসী দেশের বাদ্‌শা ছিলেন, তখন সম্রাজ্ঞী অজেনি পাশ্চাত্য জগতের বেশভূষার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁর কাশ্মিরী শাল বড় পসন্দ ছিল। কাজেই লাখো টাকার শাল ইউরোপ প্রতি বৎসর কিন্‌ত। তাঁর পতন অবধি সে ঢঙ্গ বদ্‌লে গেছে। শাল আর বিক্রি হয় না। আর আমাদের দেশের লোক দাগাই বুলোয়; নূতন একটা কিছু করে সময় মত, বাজার দখল কত্তে পার্লে না; কাশ্মীর বেজায় ধাক্কা খেলে; বড় বড় সদাগর গরীব হয়ে গেল। এ সংসার—দেখ্‌ তোর, না দেখ্‌ মোর; কেউ কি কারু জন্য দাঁড়িয়ে আছে? ওরা দশ চোখ, দুশ হাত দিয়ে দেখ্‌ছে খাট্‌ছে; আমরা—"গোঁসাইজি যা পুথিতে" লেখেন নি—তা কখনই করবো না; কর্‌বার শক্তিও গেছে। অন্ন বিনা হাহাকার!! দোষ কার? প্রতিবিধানের চেষ্টা ত অষ্টরম্ভা; খালি চীৎকার হচ্চে; বস্‌। কোণ থেকে বেরোও না, দুনিয়াটা কি চেয়ে দেখ না। আপনা আপনি বুদ্ধি শুদ্ধি আস্‌বে। দেবাসুরের গল্প ত জানই। দেবতারা আস্তিক—আত্মায় বিশ্বাস, ঈশ্বরে, পর-লোকে বিশ্বাস রাখে। অসুররা বলছে—ইহলোক

মৌলিকতা অভাবেই আমাদের অবনতি।

এই পৃথিবী ভোগ কর, এই শরীরটাকে সুখী কর। দেবতা ভাল, কি অসুর ভাল, সে কথা হচ্ছে না। বরং পুরাণের অসুরগুলোই ত দেখি, মনিষ্যির মত; দেবতাগুলো ত অনেকাংশে হীন। এখন যদি বোঝ যে, তোমরা দেবতার বাচ্ছা, আর পাশ্চাত্যেরা অসুর-বংশ, তা হলেই, দুদেশ বেশ বুঝতে পার্‌বে।

শরীর শুদ্ধি বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনা।

দেখ শরীর নিয়ে প্রথম। বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি হচ্ছে—পবিত্রতা। মাটি জল প্রভৃতির দ্বারা শরীর শুদ্ধ হয়। উত্তম; দুনিয়ায় এমন জাত কোথাও নাই, যাদের শরীর হিঁদুদের মত সাফ। হিঁদু ছাড়া আর কোনও জাত জলশৌচাদি করে না। তবু পাশ্চাত্য-দের, চীনেরা কাগজ ব্যবহার করাতে শিখিয়েছে,—কিছু বাঁচোয়া। স্নান্‌ও নেই বল্‌লেই হয়। এখন ইংরেজরা ভারতে এসে স্নান ঢুকিয়েছে দেশে। তবুও যে সব ছেলেরা বিলেতে পড়ে এসেছে, তাদের জিজ্ঞাসা কর যে, স্নানের কি কষ্ট। যারা স্নান করে—সে সপ্তায় এক দিন—সে দিন ভেতরের কাপড়, অণ্ডার-ওয়ার বদ্‌লায়। অবশ্য, এখন পয়সা-ওয়ালাদের ভেতর অনেকে নিত্যস্নায়ী। আমেরিকান্‌রা একটু বেশী। জর্ম্মান্—কালেভদ্রে; ফরাসী প্রভৃতি

কস্মিন্‌কালেও না !!! স্পেন ইতালী অতি গরম দেশ, সে আরও নয়—রাশীকৃত লসুন খাওয়া, দিন রাত ঘর্ম্মাক্ত, আর ৭ জন্মে জলস্পর্শও না। সে গায়ের গন্ধে ভূতের চোদ্দপুরুষ পালায়—ভূত ত ছেলে মানুষ। ‘স্নান’ মানে কি—মুখটি মাথাটি ধোয়া, হাত ধোওয়া—যা বাইরে দেখা যায়। আবার কি! পারিস্, সভ্যতার রাজধানী পারিস্, রঙ্গ ঢঙ্গ ভোগ বিলাসের ভূস্বর্গ পারিস্, বিদ্যা শিল্পের কেন্দ্র পারিস্, সেই পারিসে, এক বৎসর, এক বড় ধনী বন্ধু নিমন্ত্রণ করে আনলেন। এক প্রাসাদোপম মস্ত হোটেলে নিয়ে তুল্‌লেন,—রাজভোগ খাওয়া দাওয়া, কিন্তু,—স্নানের নামটী নেই। দু দিন ঠায় সহ্য করে—শেষ আর পারা গেল না। শেষ, বন্ধুকে বল্‌তে হলো—দাদা, তোমার এ রাজভোগ তোমারই থাকুক, আমার এখন “ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি” হয়েছে। এই দারুণ গরমীকাল, তাতে স্নান কর্‌বার জো নাই; হন্যে কুকুর হবার যোগাড় হয়েছে। তখন বন্ধু দুঃখিত হয়ে চটে বল্‌লেন যে, এমন হোটেলে থাকা হবে না, চল ভাল যায়গা খুজে নিইগে। ১২টা প্রধান প্রধান হোটেলে খোঁজা হলো, স্নানের স্থান

কোথাও নাই। আলাদা স্নানাগার সব আছে, সেখানে গিয়ে ৪।৫ টাকা দিয়ে একবার স্নান হবে। হরিবোল হরি! সে দিন বিকালে কাগজে পড়া গেল—এক বুড়ি স্নান কর্ত্তে টবের মধ্যে বসেছিল, সেই খানেই মারা পড়েছে!! কাযেই জন্মের মধ্যে একবার বুড়ির চামড়ার সঙ্গে জলস্পর্শ হতেই কুপোকাৎ!! এর একটি কথা অতিরঞ্জিত নয়। রুষ ফুস্ গুলো ত আসল ম্লেচ্ছ; তিব্বৎ থেকেই ও ঢং আরম্ভ। আমেরিকায় অবশ্য প্রত্যেক বাসা-বাড়িতে একটা করে স্নানের ঘর ও জলের পাইপের বন্দোবস্ত আছে।

কিন্তু তফাৎ দেখ। আমরা স্নান করি কেন?—অধর্ম্মের ভয়ে; পাশ্চাত্যরা হাত মুখ ধোয়—পরিষ্কার হবে বলে। আমাদের—জল ঢাললেই হলো, তা তেলই বেড় বেড় করুক, আর ময়লাই লেগে থাকুক। আবার, দক্ষিণি ভায়া স্নান করে এমন লম্বা চওড়া তেলক কাটলেন যে, ঝামারও সাধ্য নয় তাঁকে ঘসে তোলে। আবার আমাদের স্নান সোজা কথা, যেখানে হক ডুব লাগালেই হল। ওদের সে এক বস্তা কাপড় খুল্তে হবে, তার বন্ধনই বা

কি! আমাদের গা দেখাতে লজ্জা নেই; ওদের বেজায়! তবে পুরুষে পুরুষে কিছুমাত্র নেই—বাপ বেটার সাম্‌নে উলঙ্গ হবে—দোষ নাই। মেয়ে ছেলের সাম্‌নে আপাদমস্তক ঢাক্‌তে হবে।

'বহিরাচার' অর্থাৎ পরিষ্কার থাকাটা, অন্যান্য আচারের ন্যায়, কখন কখন অত্যাচার বা অনাচার হয়ে পড়ে। ইউরোপী বলে যে, শরীর সম্বন্ধি সমস্ত কার্য্য অতি গোপনে করা উচিত। উত্তম কথা। এই শৌচাদি ত দূরের কথা; লোক মধ্যে থুথু ফেলা একটা মহা অভদ্রতা। খেয়ে আঁচান সকলের সাম্‌নে, অতি লজ্জার কথা, কেন না কুলকুচো করা তায় আছে। লোকলজ্জার ভয়ে, খেয়ে দেয়ে মুখটি মুছে বসে থাকে;—ক্রমে দাঁতের সর্ব্বনাশ হয়। সভ্যতার ভয়ে অনাচার। আমাদের আবার, দুনিয়ার লোকের সাম্‌নে, রাস্তায় বসে, বমির নকল কর্ত্তে কর্ত্তে মুখধোওয়া, দাঁত মাজা, আঁচান,—এটা অত্যাচার। ও সমস্ত কার্য্য গোপনে করা উচিত নিশ্চিত, তবে না করাও অনুচিত।

আবার দেশভেদে যে সকল কার্য্য অনিবার্য্য, সেগুলো সমাজ সয়ে নেয়! আমাদের গরমদেশে

খেতে বসে আদ ঘড়াই জল খেয়ে ফেলি—এখন ঢেঁকুর না তুলে যাই কোথা; কিন্তু ঢেঁকুর তোলা পাশ্চাত্যদেশে অতি অভদ্রের কাজ। কিন্তু খেতে খেতে রুমাল বার করে দিব্যি নাক ঝাড়—তত দোষের নয়; আমাদের দেশে ঘৃণার কথা। এ ঠাণ্ডা দেশে নাক না ঝেড়ে মধ্যে মধ্যে থাকা যায় না।

ময়লাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে, আমরা ময়লা হয়ে থাকি অনেক সময়। ময়লায় আমাদের এত ঘৃণা যে ছুঁলে নাইতে হয়; সেই ভয়ে স্তূপাকৃতি ময়লা দোরের পাশে পচ্‌তে দিই। না ছুঁলেই হল। এদিকে যে নরককুণ্ডে বাস হচ্ছে তার কি? একটা অনাচারের ভয়ে আর একটা মহাঘোর অনাচার। একটা পাপ এড়াতে গিয়ে, আর একটা গুরুতর পাপ কর্‌ছি। যার বাড়ীতে ময়লা, সে পাপী, তাতে আর সন্দেহ কি? তার সাজাও তাকে মরে পেতে হবে না,—অপেক্ষাও বড় বেশী কর্ত্তে হবে না।

আমাদের রান্নার মত পরিষ্কার রান্না কোথাও নেই। বিলেতি খাওয়ার শৃঙ্খলার মত পরিষ্কার পদ্ধতি আমাদের নাই। আমাদের রাঁধুনি স্নান করেছে; কাপড় বদ্‌লেছে; হাঁড়ি পত্র উনুন, সব

ধুয়ে মেজে সাফ করেছে; নাকে মুখে গায়ে হাত ঠেক্‌লে, তখনি হাত ধুয়ে, তবে আবার খাদ্যদ্রব্যে হাত দিচ্ছে। বিলাতি রাঁধুনীর চোদ্দ পুরুষে কেউ স্নান করেনি; রাঁধতে রাঁধতে চাখছে, আবার সেই চাম্‌চে হাঁড়িতে ডোবাচ্ছে। রুমাল বার করে ফোঁৎ করে নাক ঝাড়লে, আবার সেই হাতে ময়দা মাখলে। শৌচ থেকে এল—কাগজ ব্যবহার করে, সে হাত ধোবার নামটিও নেই—সেই হাতে রাঁধতে লাগলো। কিন্তু, ধপ্‌ধপে কাপড় আর টুপি পরেছে। হয়ত, একটা মস্ত কাঠের টবের মধ্যে দুটো মানুষ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে, রাশীকৃত ময়দার উপর নাচ্‌ছে,—কিনা ময়দা মাখা হচ্ছে। গরমীকাল দর-বিগলিত ঘাম, পা বেয়ে, সেই ময়দায় সেঁদুচ্ছে। তার পর তার রুটি তৈয়ার যখন হল, তখন দুগ্ধফেননিভ তোয়ালের উপর চীনের বাসনে সজ্জিত হয়ে, পরিষ্কার চাদর বিছানো টেবিলের উপর, পরিষ্কার কাপড় পরা কনুই পর্য্যন্ত সাদা দস্তানা পরা চাকর, এনে সাম্‌নে ধরলে! কোনও জিনিষ হাত দিয়ে পাছে ছুঁতে হয়, তাই কনুই পর্য্যন্ত দস্তানা।

আহার সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আচারের তুলনা।

আমাদের স্নান করা বামুন, পরিষ্কার বাসনে,

পরিষ্কার হাঁড়িতে, শুদ্ধ হয়ে রেঁধে গোময়সিক্ত মাটির উপর থালশুদ্ধ অন্ন ব্যঞ্জন ঝাড়্‌লে; বামুনের কাপড়ে খাম্‌ছে ময়লা উঠ্‌ছে। হয় ত, মাটি ময়লা গোবর আর ঝোল, কলাপাতা ছেঁড়ার দরুন, একাকার হয়ে, এক অপূর্ব্ব আস্বাদ উপস্থিত কর্‌লে!!

আমরা দিব্য স্নান করে একখানা তেলচিটে ময়লা কাপড় পরলুম; আর ইউরোপে, ময়লা গায়ে, না নেয়ে একটি ধপ্‌ধপে পোষাক্ পর্‌লে। এইটি বেশ করে বোঝ, এইটি আগা গোড়ার তফাৎ— হিঁদুর সেই যে অন্তর্দ্দৃষ্টি তা আগা পাস্তলা সমস্ত কাযে। হিঁদু—ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে; বিলাতী, সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে! হিঁদুর শরীর পরিষ্কার হলেই হল, কাপড় যা তা হক্! বিলাতীর কাপড় সাফ থাকলেই হল, গায়ে ময়লা রইলই বা! হিঁদুর ঘর দোর ধুয়ে মেজে সাফ, তার বাইরে নরক-কুণ্ড থাকুক না কেন! বিলাতীর মেজে কারপেটে মোড়া ঝকঝকে, ময়লা সব ঢাকা থাক্‌লেই হল!! হিঁদুর পয়নালী রাস্তার উপর—দুর্গন্ধে বড় এসে যায় না! বিলাতীর পয়-নালী রাস্তার নীচে—টাইফয়েড্ ফিবারের বাসা!!

হিঁদু কর্চ্ছেন ভেতর সাফ্! বিলাতী কর্চ্ছেন বাইরে সাফ্!

চাই কি?—পরিষ্কার শরীরে, পরিষ্কার কাপড় পরা। মুখধোয়া দাঁতমাজা, সব চাই—কিন্তু গোপনে। ঘর পরিষ্কার চাই। রাস্তা ঘাটও পরিষ্কার চাই। পরিষ্কার রাঁধুনি, পরিষ্কার হাতের রান্না চাই। আবার পরিষ্কার মনোরম স্থানে পরিষ্কার পাত্রে খাওয়া চাই। আচারঃ প্রথমোধর্ম্মঃ; আচারের প্রথম আবার পরিষ্কার হওয়া, সব রকমে পরিষ্কার হওয়া। আচার-ভ্রষ্টের কখন ধর্ম্ম হবে? অনাচারীর দুঃখ দেখ্ছো না, দেখেও শিখ্ছ না? এত ওলাউঠা, এত মহামারী, ম্যালেরিয়া; কার দোষ? আমাদের দোষ। আমরা মহা অনাচারী!!!

আহার শুদ্ধ হলে মন শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হলে আত্মসম্বন্ধী অচলা স্মৃতি হয়—এ শাস্ত্রবাক্য আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়েই মেনেছেন। তবে শঙ্করা-চার্য্যের মতে আহার শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, আর রামানুজাচার্য্যের মতে ভোজ্যদ্রব্য। সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, দুই অর্থই ঠিক। বিশুদ্ধ আহার না হলে ইন্দ্রিয় সকল যথাযথ কার্য্য কি করেই

বা করে? কদর্য্য আহারে ইন্দ্রিয় সকলের গ্রহণ শক্তির হ্রাস হয় বা বিপর্য্যয় হয়, এ কথা সকলেরই প্রত্যক্ষ। অজীর্ণদোষে এক জিনিসকে আর এক বলে ভ্রম হওয়া এবং আহারের অভাবে দৃষ্টি আদি শক্তির হ্রাস সকলেই জানেন। সেই প্রকার কোনও বিশেষ আহার বিশেষ শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা উপস্থিত করে তাও ভূয়োদর্শনসিদ্ধ। আমাদের সমাজে যে এত খাদ্যাখাদ্যের বাচবিচার, তার মূলেও এই তত্ত্ব; যদিও অনেক বিষয়ে আমরা বস্তু ভুলে, আধারটা নিয়েই টানা হেঁচড়া করছি এখন।

রামানুজাচার্য্য ভোজ্য দ্রব্য সম্বন্ধে তিনটী দোষ বাঁচাতে বল্‌ছেন। জাতিদোষ, অর্থাৎ যে দোষ ভোজ্য দ্রব্যের জাতিগত; যেমন প্যাঁজ, লসুন ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য খেলে, মনে অস্থিরতা আসে; অর্থাৎ বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়। আশ্রয়দোষ, অর্থাৎ যে দোষ ব্যক্তিবিশেষের স্পর্শ হতে আসে; দুষ্ট লোকের অন্ন খেলেই দুষ্ট বুদ্ধি আসবেই, সতের অন্নে সৎবুদ্ধি ইত্যাদি। নিমিত্তদোষ, অর্থাৎ ময়লা কদর্য্য কীট কেশাদি দুষ্ট অন্ন খেলেও মন অপবিত্র হবে। এর মধ্যে জাতিদোষ এবং নিমিত্তদোষ

থেকে বাঁচবার চেষ্টা সকলেই কর্ত্তে পারে, আশ্রয়-দোষ হতে বাঁচা সকলের পক্ষে সহজ নয়। এই আশ্রয় দোষ থেকে বাঁচবার জন্যই আমাদের দেশে ছুৎ-মার্গ, "ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা।" তবে অনেক স্থলেই "উল্টা সমজ্‌লি রাম" হয়ে যায় এবং মানে না বুঝে, একটা কিম্ভূতকিমাকার কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। এস্থলে লোকাচার ছেড়ে লোকগুরু মহাপুরুষদের আচারই গ্রহণীয়। শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি জগদ্‌গুরু-দের জীবনে পড়ে দেখ, তাঁরা এ সম্বন্ধে কি ব্যবহার করে গেছেন। জাতিদুষ্ট অন্ন ভোজন সম্বন্ধে, ভারতবর্ষের মত শিক্ষার স্থল এখনও পৃথিবীতে কোথাও নাই। সমস্ত ভূমণ্ডলে, আমাদের দেশের মত পবিত্র দ্রব্য আহার করে, এমন আর কোনও দেশ নাই। নিমিত্ত দোষ সম্বন্ধে বর্ত্তমানকালে বড়ই ভয়ানক অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে; ময়রার দোকান, বাজারে খাওয়া, এ সব মহা অপবিত্র এবং দেখ্‌তেই পাচ্ছ, কিরূপ নিমিত্ত দোষে দুষ্ট, ময়লা, আবর্জ্জনা, পচা পক্কড় সব ওতে আছেন,—এর ফল হচ্ছে তাই। এই যে ঘরে ঘরে অজীর্ণ, ও ঐ ময়রার দোকান, বাজারে খাওয়ার ফল, এই যে প্রস্রাবের

ব্যায়রামের প্রকোপ, ওও ঐ ময়রার দোকান। ঐ যে পাড়াগেঁয়ে লোকের তত অজীর্ণ দোষ, প্রস্রাবের ব্যায়রাম হয় না, তার প্রধান কারণ হচ্ছে লুচি কচুরি প্রভৃতি বিষলড্ডুকের অভাব। এ কথা বিস্তার করে পরে বল্‌ছি।

আমিষ ও নিরামিষ ভোজন।

এই ত গেল খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে প্রাচীন সাধারণ নিয়ম। এ নিয়মের মধ্যে আবার অনেক মতামত প্রাচীন কালে চলেছে এবং আধুনিক কালে চল্‌ছে। প্রথম প্রাচীন কাল হতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত এক মহা বিবাদ, আমিষ আর নিরামিষ। মাংস ভোজন উপকারক কি অপকারক? তা ছাড়া জীবহত্যা ন্যায় বা অন্যায়, এ এক মহা বিতণ্ডা চিরদিনের। একপক্ষ বল্‌ছেন—কোনও কারণে হত্যারূপ পাপ করা উচিত নয়; আর একপক্ষ বল্‌ছেন—রাখ তোমার কথা, হত্যা না কর্‌লে প্রাণধারণই হয় না। শাস্ত্রবাদীদের ভেতরও মহাগোল। শাস্ত্রে একবার বল্‌ছেন, যজ্ঞস্থলে হত্যা কর—আবার বল্‌ছেন, জীবঘাত করো না। হিঁদুরা সিদ্ধান্ত কর্‌ছেন যে, যজ্ঞ ছাড়া অন্যত্র হত্যা করা পাপ। কিন্তু যজ্ঞ করে সুখে মাংস ভোজন কর। এমন কি, গৃহস্থের পক্ষে

অনেকগুলি নিয়ম আছে যে, সে সে স্থলে হত্যা না কর্‌লে পাপ;—যেমন শ্রাদ্ধাদি। সে সকল স্থলে নিমন্ত্রিত হয়ে মাংস না খেলে পশুজন্ম হয়—মনু বল্‌ছেন। অপরদিকে জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব বল্‌ছেন যে, তোমার শাস্ত্র মানিনি, হত্যা করা কিছুতেই হবে না। বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোক, যে যজ্ঞ কর্‌বে, বা নিমন্ত্রণ করে মাংস খাওয়াবে, তাকে সাজা দিচ্ছেন। আধুনিক বৈষ্ণব পড়েছেন কিছু ফাঁফরে—তাঁদের ঠাকুর রাম বা কৃষ্ণ মদ মাংস দিব্যি ওড়াচ্ছেন—রামায়ণ মহাভারতে রয়েছে, সীতাদেবী গঙ্গাকে মাংস, ভাত আর হাজার কলসী মদ মান্‌ছেন! * বর্ত্তমান কালে শাস্ত্রও শুন্‌বে না ও

---

* সীতামাদায় বাহুভ্যাং মধুমৈরেয়কং শুচি।
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিন্দ্রো যথামৃতং॥
মাংসানি চ সুমৃষ্টানি বিবিধানি ফলানি চ।
রামস্যাভ্যবহারার্থং কিঙ্করাস্তূর্ণমাহরন্॥ ইত্যাদি।
সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতোদনেন চ।
যক্ষ্যে ত্বাং প্রীয়তাং দেবী পুরীং পুনরুপাগতা॥
ইত্যাদি—রামায়ণ।
উভৌ মধ্বাসবক্ষিপ্তৌ উভৌ চন্দনচর্চ্চিতৌ।
উভৌ পর্য্যঙ্করথিনৌ দৃষ্টৌ মে কেশবার্জ্জুনৌ॥
—মহাভারত, আদিপর্ব্ব।

মহাপুরুষ বলেছে বল্লেও শোনে না। পাশ্চাত্যদেশে এরা লড়ছে যে, মাংস খেলে রোগ হয়, নিরামিষাশী নীরোগ হয় ইত্যাদি। এক পক্ষ বল্‌ছেন যে, মাংসাহারীর যত রোগ; অপর পক্ষ বল্‌ছেন, ও গল্প-কথা, তা হলে হিঁদুরা নীরোগী হত, আর ইংরেজ আমেরিকা প্রভৃতি প্রধান প্রধান মাংসাহারী জাত, রোগে লোপাট হয়ে যেত এতদিনে। একপক্ষ বল্‌ছেন যে, ছাগল খেলে ছাগুলে বুদ্ধি হয়, শূয়োর খেলে শূয়োরের বুদ্ধি হয়, মাছ খেলে মেছো বুদ্ধি হবে। অপর পক্ষ বল্‌ছেন যে, কপি খেলে কপো বুদ্ধি, আলু খেলে আলুয়ো বুদ্ধি এবং ভাত খেলে ভেতো বুদ্ধি। জড়বুদ্ধির চেয়ে চৈতন্যবুদ্ধি হওয়া ভাল। এক পক্ষ বল্‌ছেন, ভাত ডালে যা আছে মাংসেও তাই; অপর পক্ষ বল্‌ছেন, হাওয়াতেও তাই, তবে তুমি হাওয়া খেয়ে থাক। এক পক্ষ বলছেন যে, নিরামিষ খেয়েও লোকে কত পরিশ্রম কর্ত্তে পারে; অপর পক্ষ বল্‌ছেন, তা হলে নিরামিষাশী জাতিই প্রধান হতো; চিরকাল মাংসাশী জাতিই বলবান্ ও প্রধান। মাংসাহারী বলছে, হিঁদু চীনে দেখ, খেতে পায় না, ভাত খেয়ে শাক পাতড়া খেয়ে মরে, ওদের দুর্দ্দশা দেখ—

আর জাপানীরাও ঐ ছিল; মাংসাহার আরম্ভ করে অবধি ওদের ভোল ফিরে গেছে। ভারতবর্ষে দেড়লাখ হিন্দুস্থানী সেপাই, এদের মধ্যে, কয়জন নিরামিষ খায় দেখ। উত্তম সেপাই গোরখা বা শিখ কে কবে নিরামিষাশী দেখ। এক পক্ষ বল্‌ছেন যে, মাংসাহারে বদ হজম, আর এক পক্ষ বল্‌ছেন, সব ভুল, নিরামিষাশীগুলোরই যত পেটের রোগ। এক পক্ষ বল্‌ছেন, তোমার কোষ্ঠাশুদ্ধিরোগ শাক পাতড়া খেয়ে জোলাপবৎ ভাল হয়ে যায়, তা বলে কি দুনিয়াশুদ্ধকে তাই করতে চাও? ফল কথা চিরকালই মাংসাশী জাতেরাই যুদ্ধবীর, চিন্তাশীল ইত্যাদি। মাংসাশী জাতেরা বল্‌ছেন যে, যখন যজ্ঞের ধূম দেশময় উঠত, তখনই হিঁদুর মধ্যে ভাল ভাল মাথা বেরিয়েছে, এ বাবাজীডৌল হয়ে পর্য্যন্ত একটাও মানুষ জন্মাল না। এ বিধায় মাংসাশীরা ভয়ে মাংসাহার ছাড়তে চায় না। আমাদের দেশে আর্য্যসমাজী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিবাদ উপস্থিত। এক পক্ষ বল্‌ছেন যে, মাংস খাওয়া একান্ত আবশ্যক; আর পক্ষ বল্‌ছেন একান্ত

অন্যায়। এই ত বাদ বিবাদ চলছে। সকল পক্ষ দেখে শুনে আমার ত বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে যে, হিঁদুরাই ঠিক, অর্থাৎ হিঁদুদের ঐ যে ব্যবস্থা যে জন্মকর্ম্ম-ভেদে আহারাদি সমস্তই পৃথক্, এইটিই সিদ্ধান্ত। মাংস খাওয়া অবশ্য অসভ্যতা, নিরামিষভোজন অবশ্যই পবিত্রতর। যাঁর উদ্দেশ্য কেবল মাত্র ধর্ম্মজীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ, আর যাকে খেটে খুটে এই সংসারের দিবারাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরি চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বৈ কি। যতদিন মনুষ্যসমাজে এই ভাব থাক্‌বে, "বলবানের জয়," ততদিন মাংস খেতে হবে বা অন্য কোনও রকম মাংসের ন্যায় উপযোগী আহার আবিষ্কার কর্ত্তে হবে। নইলে বলবানের পদতলে দুর্ব্বল পেষা যাবেন। রাম কি শ্যাম নিরামিষ খেয়ে ভাল আছেন বল্লে চলেনা—জাতি জাতির তুলনা করে দেখ।

আবার নিরামিষাশীদের মধ্যেও হচ্ছে কোঁদল। একপক্ষ বল্‌ছেন যে, ভাত, আলু, গম, যব, জনার প্রভৃতি শর্করাপ্রধান খাদ্যও কিছুই নয়, ও সব মানুষে বানিয়েছে, ঐ সব খেয়েই যত রোগ। শর্করা-

উৎপাদক Starchy খাবার রোগের ঘর। ঘোঁড়া গরুকে পর্য্যন্ত ঘরে বসে চাল গম খাওয়ালে রুগী হয়ে যায়, আবার মাঠে ছেড়ে দিলে কচি ঘাস খেয়ে তাদের রোগ সেরে যায়। ঘাস শাক পাতাড় প্রভৃতি হরিৎ সবজিতে শর্করা-উৎপাদক পদার্থ বড্ড কম। বনমানুষ জাতি বাদাম ও ঘাস খায়, আলু গম ইত্যাদি খায় না; যদি খায় ত অপক্ক অবস্থায়, যখন ষ্টার্চ্চ (Starch) অধিক হয় নাই। এই সমস্ত নানাপ্রকার বিতণ্ডা চল্‌ছে। এক পক্ষ বল্‌ছেন, শূল্য মাংস আর যথেষ্ট ফল এবং দুগ্ধ এই মাত্র ভোজনই দীর্ঘ-জীবনের উপযোগী। বিশেষ ফল, ফলাহারী অনেক দিন পর্য্যন্ত যুবা থাক্‌বে, কারণ ফলের খাট্রা হাড় গোড়ে জঙ্গ্ ধর্‌তে দেয় না।

এখন সর্ব্ববাদিসম্মত মত হচ্ছে যে, পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয় এমন খাওয়া খাওয়া। অল্প আয়তনে অনেকটা পুষ্টি অথচ শীঘ্র পাক হয়, এমন খাওয়া চাই। যে খাওয়ায় পুষ্টি কম, তা কাযেই এক বস্তা খেতে হয়, কাযেই সারাদিন লাগে তাকে হজম করতে ;—যদি হজমেই সমস্ত শক্তিটুকু গেল, বাকি আর কি কায করবার শক্তি রইল ?

আমাদের দেশের খাদ্যের সমালোচনা।

ভাজা জিনিসগুলো আসল বিষ। ময়রার দোকান যমের বাড়ি। ঘি তেল গরম দেশে যত অল্প খাওয়া যায়, ততই কল্যাণ। ঘিয়ের চেয়ে মাখন শীঘ্র হজম হয়। ময়দায় কিছুই নাই, দেখতেই সাদা। গমের সমস্ত ভাগ যাতে আছে, এমন আটাই সুখাদ্য। আমাদের বাঙ্গালা দেশের জন্য এখনও দূর পল্লীগ্রামে যে সকল আহারের বন্দোবস্ত আছে, তাহাই প্রশস্ত। কোন্ প্রাচীন বাঙ্গালী কবি লুচি কচুরীর বর্ণনা কচ্ছেন ? ও লুচি কচুরী এসেছে পশ্চিম থেকে। সেখানেও কালে ভদ্রে লোকে খায়। উপরি উপরি "পাকি রসুই" খেয়ে থাকে এমন লোক ত দেখি নাই। মথুরার চোবে কুস্তিগীর লুচি-লড্ডুক-প্রিয়, দু চার বৎসরেই চোবের হজমের সর্ব্বনাশ হয়, আর চোবেজী চুরণ খেয়ে খেয়ে মরেন।

গরিবরা খাবার যোটে না বলে অনাহারে মরে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে অনাহারে মরে। যা তা পেটে পোরার চেয়ে উপবাস ভাল। ময়রার দোকানের খাবারে খাদ্য দ্রব্য কিছুই নাই, একদম্ উল্‌টা আছেন বিষ—বিষ—বিষ। পূর্ব্বে লোকে কালে ভদ্রে

ঐ পাপগুলো খেত; এখন সহরের লোক, বিশেষ বিদেশী যারা সহরে বাস করে, তাদের নিত্য ভোজন হচ্ছে ঐ। এতে অজীর্ণ রোগে অপমৃত্যু হবে তায় কি বিচিত্র! খিদে পেলে ও কচুরী জিলিবি খানায় ফেলে দিয়ে, এক পয়সার মুড়ি কিনে খাও—সস্তাও হবে, কিছু খাওয়াও হবে। ভাত, ডাল, আটার রুটি, মাছ, শাক, দুদ্ যথেষ্ট খাদ্য। তবে ডাল দক্ষিণিদের মত খাওয়া উচিত, অর্থাৎ ডালের ঝোল-মাত্র, বাকিটা গরুকে দিও। মাংস খাবার পয়সা থাকে, খাও, তবে ও পশ্চিমি নানা প্রকার গরম মশলা গুলো বাদ দিয়ে। মশলাগুলা খাওয়া নয়—ওগুলো অভ্যাসের দোষ। ডাল অতি পুষ্টিকর খাদ্য, তবে বড়ই দুষ্পাচ্য। কচি কলাই সুঁটির ডাল অতি সুপাচ্য এবং সুস্বাদ; পারিস রাজধানীর ঐ সূপ একটি বিখ্যাত খাওয়া। কচি কলাইসুঁটি খুব সিদ্ধ করে, তারপর তাকে পিষে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেল। তারপর একটা দুদ্‌ছাঁকনির মত তারের ছাঁকনিতে ছাঁক্‌লেই খোসাগুলো বেরিয়ে আস্‌বে। এখন হলুদ, ধনে, জিরেমরিচ, লঙ্কা, যা দেবার দিয়ে সাঁতলে নাও—উত্তম সুস্বাদ সুপাচ্য

ডাল হল। যদি একটা পাঁঠার মুড়ি বা মাছের মুড়ি তার সঙ্গে থাকে, ত উপাদেয় হয়।

ঐ যে এত প্রস্রাবের রোগের ধূম দেশে, ওর অধিকাংশই অজীর্ণ, দুচার জনের মাথা ঘামিয়ে, বাকি সব বদ্‌হজম। পেটে পূরলেই কি খাওয়া হলো? যেটুকু হজম হবে, সেই টুকুই খাওয়া। ভুঁড়ি নাবা বদ হজমের প্রথম চিহ্ন। শুকিয়ে যাওয়া বা মোটা হওয়া, দুটোই বদ হজম। পায়ের মাংস লোহার মত শক্ত হওয়া চাই। প্রস্রাবে চিনি বা আলবুমেন (Albumen) দেখা দিয়েছে বলেই হাঁ করে বসোনা। ওসব আমাদের দেশের কিছুই নয়। ও গ্রাহ্যের মধ্যেই এনোনা। খাওয়ার দিকে খুব নজর দাও, অজীর্ণ না হতে পায়। ফাঁকা হাওয়ায় যতক্ষণ সম্ভব থাক্‌বে। খুব হাঁট, আর পরিশ্রম কর। যেমন করে পার ছুটি নাও, আর বদরিকাশ্রম তীর্থ যাত্রা কর। হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে ১০০ ক্রোশ ঠেলে পাহাড় চড়াই করে বদরিকাশ্রম যাওয়া আসা একবার হলেই ও প্রস্রাবের ব্যারাম ফ্যারাম ভূত ভাগবে। ডাক্তার ফাক্তার কাছে আসতে দিও না, ওরা অধিকাংশ "ভাল কর্ত্তে পার্‌বো না, মন্দ কর্‌বো,

কি দিবি তাই বল্।" পারত পক্ষে ওষুধ খেয়ো না। রোগে যদি এক আনা মরে, ওষুধে মরে ১৫ আনা। পার যদি প্রতি বৎসর পূজার বন্দের সময় হেঁটে দেশে যাও। ধন হওয়া আর কুঁড়ের বাদশা হওয়া দেশে এক কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাকে ধরে হাঁটাতে হয়, খাওয়াতে হয়, সেটা ত জীবন্ত রোগী, সেটা ত হতভাগা। যেটা লুচির ফুল্‌কো ছিঁড়ে খাচ্ছে, সেটা ত মরে আছে। যে এক দমে দশ-ক্রোশ হাঁটতে পারে না, সেটা মানুষ, না কেঁচো? সেধে রোগ অকালমৃত্যু ডেকে আন্‌লে কে কি করবে?

আবার ঐ যে পাঁউরুটি, উনিও হচ্ছেন বিষ, ওঁকে ছুঁয়ো না একদম। খাম্বীর মিশলেই ময়দা এক থেকে আর হয়ে দাঁড়ান। কোনও খাম্বীরদার জিনিস খাবে না; এ বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে যে সর্ব্বপ্রকার খাম্বীরদার জিনিসের নিষেধ আছে, এ বড় সত্য। শাস্ত্রে যে কোনও জিনিস মিষ্টি থেকে টকেছে, তার নাম শুক্ত; তা খেতে নিষেধ,—কেবল দই ছাড়া। দই অতি উপাদেয়—উত্তম জিনিস। যদি একান্ত পাঁউরুটি খেতে হয়, ত তাকে পুনর্ব্বার

খুব আগুনে সেঁকে খেও। অশুদ্ধ জল আর অশুদ্ধ ভোজন রোগের কারণ। আমেরিকায় এখন জল-শুদ্ধির বড়ই ধূম। এখন ঐ যে ফিল্‌টার, ওর দিন গেছে চুকে। অর্থাৎ ফিল্‌টার জলকে ছেঁকে দেয় মাত্র, কিন্তু রোগের বীজ যে সকল কীটাণু তাতে থাকে, ওলাউঠা প্লেগের বীজ, তা যেমন তেমনিই থাকে; অধিকন্তু ফিল্‌টারটি স্বয়ং ঐ সকল বীজের জন্মভূমি হয়ে দাঁড়ান। কলকেতায় যখন প্রথম ফিল্‌টার করা জল হল, তখন পাঁচ বৎসর নাকি ওলাউঠো হয় নাই; তার পর যে কে সেই, অর্থাৎ সে ফিল্‌টার মশাই এখন স্বয়ং ওলাউঠো বীজের আবাস হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ফিল্‌টারের মধ্যে দিশি তেকাঠার উপর ঐ যে তিন কলসির ফিল্‌টার উনিই উত্তম; তবে দু তিন দিন অন্তর বালি বা কয়লা বদ্‌লে দিতে হবে বা পুড়িয়ে নিতে হবে। আর ঐ যে একটু ফট্‌কিরি দেওয়া গঙ্গাতীরস্থ গ্রামের অভ্যাস, ঐটি সকলের চেয়ে ভাল। ফট্‌কিরির গুঁড়ো যথাসম্ভব মাটি ময়লা ও রোগের বীজ সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে তলিয়ে যান। গঙ্গাজল জালায় পূরে একটু ফট্‌কিরির গুঁড়ো দিয়ে থিতিয়ে

যে আমরা ব্যবহার করি, ও তোমার বিলিতি ফিল্‌টার মিল্‌টারের চোদ্দ পুরুষের মাথায় ঝাঁটা মারে, কলের জলের দুশো বাপন্ত করে। তবে জল ফুটিয়ে নিতে পারলে নির্ভয় হয় বটে। ফট্‌কিরি-থিতোন জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ব্যবহার কর, ফিল্‌টার মিল্‌টার খানায় ফেলে দাও। এখন আমেরিকায় বড় বড় যন্ত্রযোগে জলকে একদম বাষ্প করে দেয়, আবার সেই বাষ্পকে জল করে, তার পর আর একটা যন্ত্র দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু তার মধ্যে পূরে দেয়, যে বায়ুটা বাষ্প হবার সময় বেরিয়ে যায়। সে জল অতি বিশুদ্ধ; ঘরে ঘরে এখন দেখ্‌ছি তাই। যার দুপয়সা আছে আমাদের দেশে, সে ছেলেপিলে গুলোকে নিত্য কচুরি মণ্ডা মেঠাই খাওয়াবে!! ভাত রুটি খাওয়া অপমান!! এতে ছেলেপিলে গুলো নড়ে-ভোলা পেটমেটো আসল জানোয়ার হবে না ত কি? এত বড় ষণ্ডা জাত ইংরেজ, এরা ভাজাভুজি মেঠাই মোণ্ডার নামে ভয় খায়, যাদের বরফান্ দেশে বাস, দিন রাত কসরত!! আর আমাদের অগ্নিকুণ্ডে বাস, এক ঘর থেকে আর ঘরে নড়ে বস্‌তে চাইনি, আর আহার লুচি কচুরি

মেঠাই—ঘিয়েভাজা, তেলেভাজা!! সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এক কথায় দশক্রোশ হেঁটে দিত; দুকুড়ি কই মাছ কাঁটাশুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, ১০০ বৎসর বাঁচত। তাদের ছেলেপিলেগুলো কলকেতায় আসে, চস্‌মা চখে দেয়, লুচি কচুরি খায়, দিনরাত গাড়ি চড়ে, আর প্রস্রাবের ব্যামো হয়ে মরে; কলকত্তাই হওয়ার এই ফল!! আর সর্ব্বনাশ করেছে ঐ পোড়া ডাক্তার বদ্দিগুলো। ওরা সবজান্তা, ওষুধের জোরে ওরা সব কর্ত্তে পারে। একটু পেট গরম হয়েছে, ত অমনি একটু ওষুধ দাও; পোড়া বদ্দিও বলেনা যে, দূর কর ওষুধ, যা, দুক্রোশ হেঁটে আস্‌গে যা। নানান্ দেশ দেখ্‌ছি, নানান্ রকমের খাওয়াও দেখ্‌ছি। তবে আমাদের ভাত, ডাল, ঝোল, চচ্চড়ি, শুক্তো, মোচার ঘণ্টোর জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না। দাঁত থাক্‌তে তোমরা যে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝছো না এই আপ্‌সোস। খাবার নকল কি ইংরেজের কর্ত্তে হবে—সে টাকা কোথায়? এখন আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙ্গালী খাওয়া, উপাদেয়, পুষ্টিকর ও সস্তা খাওয়া পূর্ব্ব-বাঙ্গালায়, ওদের নকল কর

যত পার। যত পশ্চিমের দিকে ঝুঁকবে, ততই খারাপ; শেষ কলাইয়ের ডাল আর মাছের টক্ মাত্র—আধা-সাঁওতালী বীরভূম বাঁকড়োয় দাঁড়াবে!! তোমরা কল্‌কেতার লোক, ঐ যে এক সর্ব্বনেশে ময়দার তালে হাতে মাটি দেওয়া ময়রার দোকান রূপ সর্ব্বনেশে ফাঁদ খুলে বসেছ, ওর মোহিনীতে বীরভূম, বাঁক্‌ড়ো, ধামাপ্রমাণ মুড়ি দামোদরে ফেলে দিয়েছে, কলায়ের ডাল গেছেন খানায়, আর পোস্তবাটা দেয়ালে লেপ দিয়েছে, ঢাকা বিক্রমপুরও টাঁইমাছ, কচ্ছপাদি জলে ছেড়ে দিয়ে, সইভ্য হচ্ছে!!! নিজেরা ত উচ্ছন্ন গেছ, আবার দেশশুদ্ধকে দিচ্ছ, এই তোমরা বড্ড্ সভ্য, সহুরে লোক! তোমাদের মুখে ছাই! ওরাও এমনি আহাম্মক যে, ঐ কল-কেতার আবর্জ্জনাগুলো খেয়ে, উদরাময় হয়ে মর মর হবে, তবু বল্‌বে না যে এগুলো হজম হচ্ছে না, বলবে—নোনা লেগেছে!! কোনও রকম করে সহুরে হবে!!

খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে ত এই মোট কথা শুন্‌লে। এখন পাশ্চাত্যেরা কি খায় এবং তাদের আহারের ক্রমশঃ কেমন পরিবর্ত্তন হয়েছে, তাও কিছু বলি।

পাশ্চাত্যদের আহার।

গরীব অবস্থায় সকল দেশের খাওয়াই ধান্যবিশেষ; এবং শাক তরকারি, মাছ মাংস বিলাসের মধ্যে এবং চাটনির মত ব্যবহৃত হয়। যে দেশে যে শস্য প্রধান ফসল, গরীবদের প্রধান খাওয়া তাই; অন্যান্য জিনিস আনুষঙ্গিক। যেমন বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা, ও মান্দ্রাজ উপকূলে ও মালাবার উপকূলে ভাত প্রধান খাদ্য; তার সঙ্গে ডাল তরকারি, কখন কখন মাছমাংস চাটনিবৎ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য সর্ব্বদেশে অবস্থাপন্ন লোকের জন্য গমের রুটি ও ভাত; সাধারণ লোকের নানা-প্রকার বজ্‌রা, মড়ুয়া, জনার, ঝিঙ্গোরা প্রভৃতি ধান্যের রুটি প্রধান খাদ্য।

শাক, তরকারি, ডাল, মাছ, মাংস, সমস্তই সমগ্র ভারতবর্ষে, ঐ রুটি বা ভাতকে সুস্বাদ করবার জন্য ব্যবহার—তাই ওদের নাম ব্যঞ্জন। এমন কি, পঞ্জাব, রাজপুতানা ও দাক্ষিণাত্য দেশে, অবস্থাপন্ন আমিষাশী লোকেরাও, এমন কি রাজারাও, যদিও নিত্য নানাপ্রকার মাংস ভোজন করে, তথাপি রুটি বা ভাতই প্রধান খাদ্য। যে ব্যক্তি আধ্‌সের মাংস নিত্য খায়, সে এক সের রুটি তার সঙ্গে নিশ্চিৎ খায়।

পাশ্চাত্য দেশে এখন যে সকল গরীব দেশ আছে এবং ধনী দেশের গরীবদের মধ্যে, ঐ প্রকার রুটি এবং আলুই প্রধান খাদ্য ; মাংসের চাট্‌নি মাত্র— তাও কালে ভদ্রে। স্পেন, পোর্ত্তুগাল, ইতালি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উষ্ণদেশে যথেষ্ট দ্রাক্ষা জন্মায় এবং দ্রাক্ষা-ওয়াইন্ অতি সস্তা। সে সকল ওয়াইনে মাদকতা নাই (অর্থাৎ পিপেখানেক না খেলে ত আর নেসা হবে না এবং তা কেউ খেতেও পারে না) এবং যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। সে দেশের দরিদ্র লোকে এজন্য মাছ মাংসের জায়গায় ঐ দ্রাক্ষা-রস দ্বারা পুষ্টি সংগ্রহ করে। কিন্তু উত্তরাঞ্চল, যেমন রুসিয়া, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে দরিদ্র লোকের আহার প্রধানতঃ রাই-নামক ধান্যের রুটি ও এক আধ্ টুক্‌রা শুঁট্‌কি মাছ ও আলু।

ইউরোপের অবস্থাপন্ন লোকের এবং আমেরিকার আবালবৃদ্ধবনিতার খাওয়া আর এক রকম, অর্থাৎ রুটি, ভাত প্রভৃতি চাট্‌নি এবং মাছ মাংসই হচ্ছে খাওয়া। আমেরিকায় রুটি খাওয়া নাই বল্লেই হয়। মাছ মাছই এলো, মাংস মাংসই এলো, তাকে অমনি খেতে হবে, ভাত রুটির সংযোগে নয়। এবং এজন্য

প্রত্যেক বারেই থালা বদ্‌লান হয়। যদি দশটা খাবার জিনিস থাকে, ত দশবার থালা বদ্‌লাতে হয়। যেমন মনে কর, আমাদের দেশে প্রথমে শুধু শুক্ত এলো, তার পর থালা বদ্‌লে শুধু ডাল এলো, আবার থালা বদ্‌লে শুধু ঝোল এলো, আবার থালা বদ্‌লে দুটি ভাত, নয় ত দুখান লুচি ইত্যাদি। এর লাভের মধ্যে এই যে, নানা জিনিস অল্প অল্প খাওয়া হয়, পেট বোঝাই করা হয় না। ফরাসী চাল সকালবেলা "কাফি" এবং এক আদ্‌ টুক্‌রা রুটি-মাখম; দুপর বেলা মাছ মাংস ইত্যাদি মধ্যবিৎ; রাত্রে লম্বা খাওয়া। ইতালি, স্পেন প্রভৃতি জাতি-দের ঐ এক রকম; জর্ম্মান্‌রা ক্রমাগত খাচ্ছে,—পাঁচ বার, ছ বার, প্রত্যেক বারেই অল্প বিস্তর মাংস। ইংরাজরা তিনবার; সকালে অল্প, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কফি-যোগ, চা-যোগ আছে। আমেরিকান্‌দের তিন-বার—উত্তম ভোজন, মাংস প্রচুর। তবে এ সকল দেশেই "ডিনার"টা প্রধান খাদ্য—ধনী হলে, তার ফরাসী রাঁধুনি এবং ফরাসী চাল। প্রথমে একটু আদটু নোনা মাছ বা মাছের ডিম, বা কোনও চাটনি বা সব্‌জি। এটা হচ্ছে ক্ষুধাবৃদ্ধি। তার পর সূপ

তার পর আজকাল ফ্যাসান—একটা ফল; তার পর মাছ; তার পর মাংসের একটা তরকারি; তার পর থান্ মাংস শূল্য, সঙ্গে কাঁচা সব্‌জি; তার পর আরণ্য মাংস মৃগপক্ষ্যাদি; তার পর মিষ্টান্ন; শেষ কুল্পী—মধুরেণ সমাপয়েৎ। ধনী হলে প্রায় প্রত্যেক বার থাল বদ্‌লাবার সঙ্গে সঙ্গে মদ বদ্‌লাচ্ছে,—সেরি, ক্লারেট্, স্যামপাঁ ইত্যাদি এবং মধ্যে মধ্যে মদের কুল্পী একটু আধটু। থাল বদ্‌লাবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা চামচ সব বদ্‌লাচ্ছে। আহারান্তে "কাফি"—বিনা দুগ্ধ, আসব মদ্য খুদে খুদে গ্লাসে এবং ধূমপান। খাওয়ার রকমারির সঙ্গে মদের রকমারি দেখাতে পার্‌লে, তবে বড়মানসি চাল বল্‌বে। একটা খাওয়ায় আমাদের দেশের একটা মধ্যবিৎ লোক সর্ব্বস্বান্ত হতে পারে, এমন খাওয়ার ধূম এরা করে।

আর্য্যরা একটা পীঠে বসত, একটা পীঠ ঠেসান দিত এবং একটা জলচৌকীর উপর থালা রেখে, এক থালাতেই সকল খাওয়া খেত। ঐ চাল্ এখনও পঞ্জাব, রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র ও গুর্জ্জর দেশে বিদ্যমান। বাঙ্গালী, উড়ে, তেলিঙ্গি, মালাবারি প্রভৃতি মাটিতেই "সাপ্‌ড়ান"। মহীশূরের মহারাজও

মাটিতে আঙ্গট্ পাতে ভাত ডাল খান। মুসলমানেরা চাদর পেতে খায়। বর্ম্মি, জাপানী প্রভৃতি উপু হয়ে বসে মাটিতে থাল রেখে খায়। চীনেরা টেবিলে খায়; চেয়ারে বসে, কাটি ও চামচ্ যোগে খায়। রোমান ও গ্রীক্‌রা কোচে শুয়ে, টেবিলের উপর থেকে হাত দিয়ে খেত। ইউরোপীরা টেবিলের উপর হতে, কেদারায় বসে, হাত দিয়ে পূর্ব্বে খেত; এখন নানাপ্রকার কাঁটা চামচ্।

চীনের খাওয়াটা কসরৎ বটে—যেমন আমাদের পানওয়ারীরা দুখানা সম্পূর্ণ আলাদা লোহার পাতকে হাতের কায়দায় কাঁচির কায করায়, চীনেরা তেমনি দুটো কাটিকে ডান হাতের দুটো আঙ্গুল আর মুটোর কায়দায় চিম্‌টের মত করে শাকাদি মুখে তোলে। আবার দুটোকে একত্র করে, এক বাটি ভাত মুখের কাছে এনে, ঐ কাটিদ্বয়নির্ম্মিত খোন্তাযোগে ঠেলে ঠেলে মুখে পোরে।

সকল জাতিরই আদিম পুরুষ নাকি প্রথম অবস্থায় যা পেত তাই খেত। একটা জানোয়ার মার্‌লে, সেটাকে এক মাস ধরে খেত; পচে উঠ্‌লেও তাকে ছাড়ত না। ক্রমে সভ্য হয়ে উঠ্‌লো, চাষ বাস্

শিখ্‌লে; আরণ্য পশুকুলের মত একদিন বেদম্‌ খাওয়া, আর দু পাঁচ দিন অনশন ঘুচ্‌লো; আহার নিত্য জুট্‌তে লাগ্‌ল; কিন্তু পচা জিনিস খাব্যর চাল একটা দাঁড়িয়ে গেল। পচা দুর্গন্ধ একটা যা হয় কিছু, আবশ্যক ভোজ্য হতে নৈমিত্তিক আদরের চাট্‌নি হয়ে দাঁড়াল।

এস্কুইমো জাতি বরফের মধ্যে বাস করে। শস্য সে দেশে একদম্‌ জন্মায় না; নিত্য ভোজন—মাছ মাংস; ১০।৫ দিনে অরুচি বোধ হলে, এক টুকরা পচা মাংস খায়—অরুচি সারে।

ইউরোপীরা এখনও বন্য পশু পক্ষীর মাংস না পচ্‌লে খায় না। তাজা পেলেও, তাকে টাঙ্গিয়ে রাখে—যতক্ষণ না পচে দুর্গন্ধি হয়। কলকেতায় পচা হরিণের মাংস পড়্‌তে পায় না; রসা ভেট্‌কির উপাদেয়তা প্রসিদ্ধ। ইংরেজদের পনীর যত পচ্‌বে, যত পোকা কিল্‌বিল করবে, ততই উপাদেয়। পলায়মান পনীর-কীটকেও তাড়া করে ধরে মুখে পুরবে—তা নাকি বড়ই সুস্বাদ!! নিরামিষাশী হয়েও প্যাঁজ লসুনের জন্য ছোঁক ছোঁক করবে। দক্ষিণী বামুনের প্যাঁজ লসুন নইলে খাওয়াই হবে না।

শাস্ত্রকারেরা সে পথও বন্ধ করে দিলেন। প্যাঁজ, লসুন, গেঁও শোর, গেঁয়ো মুরগি খাওয়া এক জাতের পাপ, সাজা—জাতিনাশ। যারা শুন্‌লে এ কথা, তারা ভয়ে প্যাঁজ লসুন ছাড়্‌লে, কিন্তু তার চেয়ে বিষমতুর্গন্ধ হিঙ্গ খেতে আরম্ভ কর্‌লে!! পাহাড়ি গোঁড়া হিঁদু লসুনে-ঘাস প্যাঁজ লসুনের জায়গায় ধর্‌লে। ও দুটোর নিষেধ ত আর পুঁথিতে নেই!!

আহার সম্বন্ধীয় বিধি নিষেধের তাৎপর্য্য।

সকল ধর্ম্মেই খাওয়া দাওয়ার একটা বিধি নিষেধ আছে; নাই কেবল ক্রিশ্চানি ধর্ম্মে। জৈন, বৌদ্ধয় মাছ মাংস খাবেই না। জৈন আবার যা মাটির নীচে জন্মায়, আলু মুলো প্রভৃতি, তাও খাবে না। খুঁড়তে গেলে পোকা মর্‌বে, রাত্রে খাবে না—অন্ধকারে পাছে পোকা খায়।

য়াহুদীরা যে মাছে আঁশ নেই তা খাবে না, শোর খাবে না, যে জানোয়ার দ্বিশফ নয় এবং জাগর কাটে না, তাকেও খাবে না। আবার বিষম কথা, দুধ বা দুগ্ধোৎপন্ন কোনও জিনিস যদি হেঁসেলে ঢোকে, যখন মাছ মাংস রান্না হচ্ছে, ত সে সব রান্না ফেলে দিতে হবে। এ বিধায় গোঁড়া য়াহুদী অন্য কোনও জাতির রান্না খায় না। আবার হিঁদুর মত য়াহুদীরা

বৃথা-মাংস খায় না। যেমন বাঙ্গালা দেশ ও পঞ্জাবে মাংসের নাম "মহাপ্রসাদ"। য়াহুদীরা সেই প্রকার মহাপ্রসাদ অর্থাৎ যথানিয়মে বলিদান না হলে, মাংস খায় না। কাযেই হিঁদুর মত য়াহুদীদেরও যে সে দোকান হতে মাংস কেনবার অধিকার নাই। মুসলমানেরা য়াহুদীদের অনেক নিয়ম মানে, তবে অত বাড়াবাড়ি করে না; দুধ মাছ মাংস একসঙ্গে খায় না এই মাত্র, ছোঁয়া ছুঁয়ি হলেই যে সর্ব্বনাশ, অত মানে না। য়াহুদীদের আর হিঁদুদের অনেক সৌসাদৃশ্য—খাওয়া সম্বন্ধে; তবে য়াহুদীরা বুনো শোরও খায় না, হিঁদুরা খায়। পঞ্জাবে মুসলমান হিঁদুর বিষম সংঘাত থাকায়, বুনো শোর আবার হিঁদুদের একটা অত্যাবশ্যক খাওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজপুতদের মধ্যে বুনো শোর শিকার করে খাওয়া, একটা ধর্ম্মবিশেষ। দক্ষিণ দেশে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য জাতের মধ্যে গেঁও শোরও যথেষ্ট চলে। হিঁদুরা বুনো মুরগী খায়, গেঁও খায় না। বাঙ্গালা দেশ থেকে নেপাল ও আকাশ্মীর হিমালয় এক রকম চালে চলে। মনূক্ত খাওয়ার প্রথা এই অঞ্চলেই সমধিক বিদ্যমান আজও।

কিন্তু কুমায়ুন হতে আরম্ভ করে কাশ্মীর পর্য্যন্ত, বাঙ্গালী, বেহারী, প্রয়াগী ও নেপালীর চেয়েও মন্থুর আইন বিশেষ প্রচার। যেমন বাঙ্গালী মুরগী বা মুরগীর ডিম খায় না, কিন্তু হাঁসের ডিম খায়, নেপালীও তাই; কিন্তু কুমায়ুন হতে তাও চলে না। কাশ্মীরীরা বুনো হাঁসের ডিম পেলে সুখে খায়, গ্রাম্য নয়।

আলাহাবাদের পর হতে, হিমালয় ছাড়া, ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত দেশে যে ছাগল খায়, সে মুরগীও খায়।

এই সকল বিধি নিষেধের মধ্যে অধিকাংশই যে স্বাস্থ্যের জন্য, তার সন্দেহ নাই। তবে সকল জায়গায় সমান পারে না। শোর মুরগী যা তা খায়, অতি অপরিষ্কার জানোয়ার, কাযেই নিষেধ; বুনো জানোয়ার কি খায় কে দেখ্‌তে যায় বল। তা ছাড়া রোগ, বুনো জানোয়ারে কম।

দুধ, পেটে অম্লাধিক্য হলে একেবারেই দুষ্পাচ্য, এমন কি একদমে এক গ্লাস দুধ খেয়ে কখন কখন সন্তঃ মৃত্যু ঘটেছে। দুধ, যেমন শিশুতে মাতৃস্তন্য পান করে, তেম্‌নি ঢোকে ঢোকে খেলে তবে শীঘ্র হজম হয়, নতুবা অনেক দেরী লাগে। দুধ একটা

গুরুপাক জিনিস মাংসের সঙ্গে হজম আরও গুরু-পাক, কাযেই এ নিষেধ য়াহুদীদের মধ্যে। মূর্খ মাতা কচিছেলেকে জোর করে ঢক্ ঢক্ করে দুধ খাওয়ায়, আর দু ছ মাসের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদে !! এখনকার ডাক্তারেরা পূর্ণবয়স্কের জন্যও একপোয়া দুধ আস্তে আস্তে আধ ঘণ্টায় খাওয়ার বিধি দেন ; কচিছেলেদের জন্য "ফিডিং বটল" ছাড়া উপায়ান্তর নাই। মা ব্যস্ত কাযে—দাসী একটা ঝিনুকে করে, ছেলেটাকে চেপে ধরে সাঁ সাঁ দুধ খাওয়াচ্ছে ! ! লাভের মধ্যে এই যে, রোগা-পট্‌কা গুলো আর বড়, বড় হচ্ছে না, তারা ঐখানেই জন্মের দুধ খাচ্ছে ; আর যে গুলো এ বিষম খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে ঠেলে ঠুলে উঠ্‌ছে, সে গুলো প্রায় সুস্থ-কায় এবং বলিষ্ঠ।

সেকেলে আঁতুড় ঘর, দুধ খাওয়ান প্রভৃতির হাত থেকে যে ছেলেপিলেগুলো বেঁচে উঠ্‌তো, সে গুলো একরকম সুস্থ সবল আজীবন থাকৃত। মা ষষ্ঠীর সাক্ষাৎ বরপুত্র না হলে কি আর সেকালে একটা ছেলে বাঁচতো ! ! সে তাপসেঁক, দাগা, ফোঁড়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বেঁচে ওঠা, প্রসূতি ও প্রসূত

উভয়েরই পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। হরিল্লুঠের, তুলসীতলার খোকা ও মা দুই প্রায় বেঁচে যেত, সাক্ষাৎ যমরাজের দূত চিকিৎসকের হাত এড়াত বলে।

কাপড়ে সভ্যতা।

সকল দেশেই কাপড়ে চোপড়ে কিছু না কিছু ভদ্রতা লেগে থাকে। "বেতন না জান্‌লে বোদ্র অবদ্র বুঝবো ক্যাম্‌নে ?" শুধু ব্যাতনে নয়, "কাপড় না দেখ্‌লে ভদ্র অভদ্র বুঝ্‌বো ক্যাম্‌নে" সর্ব্বদেশে কিছু না কিছু চলন। আমাদের দেশে শুধু গায়ে ভদ্রলোক রাস্তায় বেরুতে পারে না; ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আবার পাগড়ী না মাথায় দিয়ে কেউই রাস্তায় বেরোয় না। পাশ্চাত্য দেশে ফরাসীরা বরাবর সকল বিষয়ে অগ্রণী,—তাদের খাওয়া, তাদের পোষাক সকলে নকল করে। এখনও ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিশেষ বিশেষ পোষাক বিদ্যমান, কিন্তু ভদ্র হলেই, দুপয়সা হলেই, অমনি সে পোষাক অন্তর্দ্ধান হন, আর ফরাসী পোষাকের আবির্ভাব। কাবুলি-পাজামা-পরা ওলন্দাজি চাষা, ঘাঘরা-পরা গ্রীক, তিব্বতি-পোষাক-পরা রুষ, যেমন "বোদ্র" হওয়া, অমনি ফরাসী কোট প্যাণ্টালুনে

আবৃত হয়। মেয়েদের ত কথাই নাই, তাদের পয়সা হয়েছে কি পারি রাজধানীর পোষাক পর্‌তে হবেই হবে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মনী এখন ধনী জাত; ও সব দেশে সকলেরই একরকম পোষাক—সেই ফরাসী নকল। তবে আজকাল পারি অপেক্ষা লণ্ডনে পুরুষদের পোষাক ভব্যতর, তাই পুরুষের পোষাক "লণ্ডন মেড্" আর মেয়েদের পারিসিয়েন নকল। যাদের বেশী পয়সা, তারা ঐ দুই স্থান হতে তৈয়ারী পোষাক বারমাস ব্যবহার করে। আমেরিকা বিদেশী আমদানী পোষাকের উপর ভয়ানক মাশুল বসায়, সে মাশুল দিয়েও পারি লণ্ডনের পোষাক পর্ত্তে হবে। এ কায একা আমেরিকান্‌রা পারে—আমেরিকা এখন কুবেরের প্রধান আড্ডা!

প্রাচীন আর্য্যজাতিরা ধুতি চাদর পর্‌ত; ক্ষত্রিয়দের ইজার ও লম্বা জামা, লড়ায়ের সময়। অন্য সময় সকলেরই ধুতি চাদর। কিন্তু পাগড়ীটা ছিল। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে মেয়ে মদ্দে পাগড়ী পর্‌ত। এখন যেমন বাঙ্গালা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে কপ্‌নি মাত্র থাক্‌লেই শরীর ঢাকার কায হলো, কিন্তু

পাগড়ীটা চাই; প্রাচীনকালেও তাই ছিল, মেয়ে মদ্দে। বৌদ্ধদের সময়ের যে সকল ভাস্কর্য্যমূর্ত্তি পাওয়া যায়, তার মেয়ে মদ্দে কৌপীন-পরা। বুদ্ধদেবের বাপ্ কপ্‌নি পরে বসেছেন সিংহাসনে; তদ্বৎ মাও বসেছেন—বাড়ার ভাগ, এক পা মল ও এক হাত বালা; কিন্তু পাগড়ী আছে!! সম্রাট্ ধর্ম্মাশোক ধুতি পরে, চাদর গলায় ফেলে, আদুড় গায়ে, একটা ডমরু-আকার আসনে বসে নাচ দেখছেন। নর্ত্তকীরা দিব্যি উলঙ্গ; কোমর থেকে কতকগুলো ন্যাকড়ার ফালি ঝুল্‌ছে। মোদ্দা পাগড়ী আছে। নেবু টেবু সব ঐ পাগড়ীতে। তবে রাজ-সামন্তরা ইজার ও লম্বা জামা পরা—চুস্ত ইজার ও চোগা। সারথি নলরাজ এমন রথ চালালেন যে, রাজা ঋতুপর্ণের চাদর কোথায় পড়ে রইল; রাজা ঋতুপর্ণ আদুড় গায়ে বে কর্‌তে চল্‌লেন। ধুতি চাদর আর্য্যদের চিরন্তন পোষাক, এই জন্যই ক্রিয়াকর্ম্মের বেলায় ধুতি চাদর পর্‌তেই হয়।

প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমানদের পোষাক ছিল ধুতি চাদর; একথান বৃহৎ কাপড় ও চাদর—নাম "তোগা," তারি অপভ্রংশ এই "চোগা"। তবে

কখনও কখনও একটা পিরহানও পরা হত। যুদ্ধ-কালে ইজার জামা। মেয়েদের একটা খুব লম্বা চৌড়া চারকোণা জামা, যেমন দুখানা বিছানার চাদর লম্বা লম্বি সেলাই করা, চওড়ার দুদিক খোলা। তার মধ্যে ঢুকে কোমরটা বাঁধলে দুবার,—একবার বুকের নীচে, একবার পেটের নীচে। তার পর, উপরের খোলা দুপাট দু হাতের উপর দু জায়গায় তুলে মোটা ছুঁচ দিয়ে আট্‌কে দিলে, যেমন উত্তরা-খণ্ডের পাহাড়িরা কম্বল পরে। সে পোষাক অতি সুন্দর ও সহজ। ওপরে একখান চাদর।

কাটা কাপড় এক ইরাণীরা প্রাচীনকাল হতে পরত। বোধ হয় চীনেদের কাছে শেখে। চীনেরা হচ্ছে সভ্যতার অর্থাৎ ভোগবিলাসের সুখস্বচ্ছন্দতার আদ্‌গুরু। অনাদি কাল হতে চীনে টেবিলে খায়, চেয়ারে বসে, যন্ত্র তন্ত্র কত খাওয়ার জন্য, এবং কাটা পোষাক নানা রকম, ইজার, জামা, টুপিটাপা পরে।

সিকন্দর সা ইরাণ জয় করে, ধুতি চাদর ফেলে ইজার পর্‌তে লাগলেন। তাতে তাঁর স্বদেশী সৈন্যরা এমন চটে গেল যে, বিদ্রোহ হবার মত হয়েছিল।

মোদ্দা সিকন্দর নাছাড় পুরুষ, ইজার জামা চালিয়ে দিলেন।

গরমদেশে কাপড়ের দরকার বড় হয় না। কৌপীনমাত্রেই লজ্জানিবারণ, বাকি কেবল অলঙ্কার। ঠাণ্ডাদেশে শীতের চোটে অস্থির, অসভ্য অবস্থায় জানোয়ারের ছাল টেনে পরে, ক্রমে কম্বল পরে, ক্রমে জামা; পাজামা ইত্যাদি নানান্ খানা হয়। তার-পর আদুড় গায়ে গয়না পরতে গেলেই ত ঠাণ্ডায় মৃত্যু, কাযেই অলঙ্কার-প্রিয়তাটা ঐ কাপড়ের উপর গিয়ে পড়ে। যেমন আমাদের দেশে গয়নার ফ্যাসান্ বদলায়, এদের তেমন ঘড়ি ঘড়ি বদ্লাচ্ছে কাপড়ের ফ্যাসান্।

ঠাণ্ডাদেশমাত্রেই এজন্য সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গ না ঢেকে কারু সাম্নে বেরুবার যো নাই। বিলেতে ঠিক ঠিক পোষাকটি না পরে ঘরের বাইরে যাবার যো নাই। পাশ্চাত্যদেশের মেয়েদের পা দেখান বড়ই লজ্জা; কিন্তু গলা ও বুকের খানিকটা দেখান যেতে পারে। আমাদের দেশে মুখ দেখান বড়ই লজ্জা; কিন্তু সে ঘোমটা টানার চোটে সাড়ি কোমরে ওঠেন উঠুন, তায় দোষ নাই। রাজপুতানার ও হিমাচলের অষ্টাঙ্গ ঢেকে তলপেট দেখান!

পাশ্চাত্য দেশের নর্ত্তকী ও বেশ্যারা লোক ভুলাবার জন্য অনাচ্ছাদিত। এদের নাচের মানে তালে তালে শরীর অনাবৃত করে দেখান। আমাদের দেশের আদুড় গা ভদ্রলোকের মেয়ের; নর্ত্তকী বেশ্যা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। পাশ্চাত্য দেশে মেয়েছেলে সর্ব্বদাই গা-ঢাকা, গা আদুড় করলে আকর্ষণ বেশী হয়; আমাদের দেশে দিন রাত আদুড় গা, পোষাক পরে ঢেকে ঢুকে থাকলেই আকর্ষণ অধিক। মালাবার দেশে মেয়ে মদ্দের কৌপীনের উপর বহির্বাসমাত্র, আর বস্ত্রমাত্রই নাই। বাঙ্গালিরও তাই, তবে কৌপীন নাই এবং পুরুষদের সাক্ষাতে মেয়েরা গাটা মুড়ি ঝুড়ি দিয়ে ঢাকে।

পাশ্চাত্য দেশে পুরুষে পুরুষে সর্ব্বাঙ্গ অক্লেশে উলঙ্গ হয়—আমাদের মেয়েদের মত। বাপে ছেলেয় সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ করে স্নানাদি করে, দোষ নাই। কিন্তু মেয়েদের সামনে, বা রাস্তা ঘাটে, বা নিজের ঘর ছাড়া, সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা চাই।

এক চীনে ছাড়া সর্ব্বদেশেই এ লজ্জা সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত বিষয় দেখ্‌ছি—কোনও বিষয়ে বেজায় লজ্জা, আবার তদপেক্ষা অধিক লজ্জাকর বিষয়ে

আদতে লজ্জা নাই। চীনে মেয়ে মদ্দে সর্ব্বদা আপাদমস্তক ঢাকা। চীনে কন্‌ফুছের চেলা, বুদ্ধের চেলা, বড় নীতি দুরস্ত। খারাপ কথা, চাল, চলন—তৎক্ষণাৎ সাজা। কৃশ্চান পাদ্রী গিয়ে চীনে ভাষায় বাইবেল ছাপিয়ে ফেল্‌লে। এখন বাইবেল পুরাণ হচ্ছেন হিঁদুর পুরাণের চোদ্দ পুরুষ—সে দেবতা মানুষের অদ্ভুত কেলেঙ্কার পড়ে চীনে ত চটে অস্থির, বল্‌লে, "এ বই কিছুতেই এদেশে চালান হবে না, এ—ত—অতি অশ্লীল কেতাব"; তার উপর পাদ্রিনী বুকখোলা সান্ধ্য পোষাক পরে, পর্দ্দার বার হয়ে, চীনেদের নিমন্ত্রণে আহ্বান কর্‌লেন। চীনে মোটা-বুদ্ধি, বল্‌লে—"সর্ব্বনাশ! এই খারাপ বই পড়িয়ে, আর এই মাগীদের আদুড় গা দেখিয়ে, আমাদের ছোঁড়া বইয়ে দিতে, এ ধর্ম্ম এসেছে।" এই হচ্ছে চীনের কৃশ্চানের উপর মহাক্রোধ। নতুবা চীনে কোনও ধর্ম্মের উপর আঘাত করে না। শুন্‌ছি যে, পাদ্রীরা এখন অশ্লীল অংশ ত্যাগ করে বাইবেল ছাপিয়েছে; কিন্তু চীনে তাতে আরও সন্দিহান।

আবার এ পাশ্চাত্য দেশে, দেশবিশেষে লজ্জা-ঘেন্নার তারতম্য আছে। ইংরেজ, আমেরিকানের

লজ্জা সরম একরকম; ফরাসীর আর একরকম; জর্ম্মানের আর একরকম। রুষ আর তিব্বতি বড় কাছাকাছি; তুরুস্কের আর এক ঢৌল; ইত্যাদি।

আমাদের দেশের চেয়ে ইউরোপে ও আমেরিকায় মলমূত্রাদি ত্যাগে বড়ই লজ্জা। আমরা হচ্ছি নিরামিষভোজী—এক কাঁড়ি ঘাস পাতা আহার। আবার বেজায় গরম দেশ, এক দমে লোটাভর জল খাওয়া চাই। পশ্চিমী চাষা সেরভর্ ছাতু খেলে; তার পর, পাতকোকে পাতকোই খালি করে ফেল্‌লে, জল খাওয়ার চোটে। গরমী কালে আমরা বাঁশ বার করে দিই, লোককে জল খাওয়াতে। কাযেই সে সব যায় কোথা বল। দেশ বিষ্ঠামূত্রময় না হয়ে যায় কোথা? গরুর গোয়াল, ঘোঁড়ার আস্তাবল, আর বাঘ সিঙ্গির পিঁজরার তুলনা কর দিকি!

চালচলন

কুকুর আর ছাগলের তুলনা কর দিকি? পাশ্চাত্য দেশের আহার মাংসময়, কাযেই অল্প; আর ঠাণ্ডা দেশ, জল খাওয়া নাই বল্লেই হয়। ভদ্রলোকের খুদে খুদে গ্লাসে একটু মদ খাওয়া। ফরাসীরা জলকে বলে, ব্যাঙের রস; তা কি খাওয়া চলে? এক আমেরিকান জল খায় কিছু বেশী, কারণ, ওদের

দেশ গরমী কালে ভয়ঙ্কর গরম, নিউইয়র্ক কলকেতার চেয়েও গরম। আর জর্ম্মান্‌রা বড্ড্ "বিয়র" পান করে, কিন্তু সে খাবার সঙ্গে নয় বড়।

ঠাণ্ডা দেশে সর্দ্দি লাগ্‌বার সদাই সম্ভাবনা; গরম দেশে খেতে বসে ঢক্ ঢক্ জল। এরা কাযেই না হেঁচে যায় কোথা, আর আমরা ঢেঁকুর না তুলেই বা যাই কোথা। এখন দেখ নিয়ম—এ দেশে খেতে বসে যদি ঢেঁকুর তুলেছ, ত সে বেআদবীর আর পার নাই। কিন্তু রুমাল বার করে, তাতে ভড়্ ভড়্ করে সিক্‌নি ঝাড়, এদের তায় ঘেন্না হয় না। আমাদের ঢেঁকুর না তুল্‌লে নিমন্ত্রক খুসীই হন্ না; কিন্তু পাঁচজনের সঙ্গে খেতে খেতে ভড় ভড় করে সিক্‌নি ঝাড়াটা কেমন?

ইংলণ্ডে আমেরিকায় মলমূত্রের নামটি আন্‌বার যো নাই, মেয়েদের সাম্‌নে। পাইখানায় যেতে হবে চুরি করে। পেট গরম হয়েছে, বা পেটের কোনও প্রকার অসুখের কথা মেয়েদের সাম্‌নে বলবার যো নাই। অবশ্য বুড়ী টুড়ী আলাপী আলাদা কথা। মেয়েরা মলমূত্র চেপে মরে যাবে, তবুও পুরুষের সাম্‌নে ও নামটিও আন্‌বে না।

ফরাসী দেশে অত নয়। মেয়েদের মলমূত্রের স্থানের পাশেই পুরুষদের; এরা এ দোর দিয়ে যাচ্ছে, ওরা ও দোর দিয়ে যাচ্ছে; অনেক স্থানে এক দোর, ঘর আলাদা। রাস্তার দু ধারে মাঝে মাঝে প্রস্রাবের স্থান, তা খালি পিঠটা ঢাকা পড়ে মাত্র; মেয়েরা দেখছে, তায় লজ্জা নাই, আমাদের মত। অবশ্য মেয়েরা অমন অনাবৃত স্থানে যায় না। জর্ম্মান্‌দের আরও কম।

ইংরেজ আমেরিকান্‌রা কথাবার্ত্তায়ও বড় সাবধান, মেয়েদের সাম্‌নে। সে ঠ্যাঙ্গ্‌ বল্‌বার পর্য্যন্ত যো নাই। ফরাসীরা আমাদের মত মুখ খোলা; জর্ম্মান্‌, রুষ প্রভৃতি সকলের সাম্‌নে খিস্তি করে।

কিন্তু প্রেম প্রণয়ের কথা অবাধে মায় ছেলেয়, ভায়ে বোনে বাপে তা চলেছে। বাপ মেয়ের প্রণয়ীর (ভবিষ্যৎ বরের) কথা নানা রকম ঠাট্টা করে মেয়েকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছে। ফরাসীর মেয়ে তায় অবনতমুখী, ইংরেজের মেয়ে ব্রীড়াশীলা, আর মার্কিনের মেয়ে চোট্‌পাট জবাব দিচ্ছে। চুম্বন, আলিঙ্গনটা পর্য্যন্ত দোষাবহ নয়, অশ্লীল নয়। সে সব কথা কওয়া চলে। আমেরিকায় পরিবারের

পুরুষবন্ধুও আত্মীয়তা হলে, বাড়ীর যুবতী মেয়েদেরও সেকহ্যাণ্ডের স্থলে চুম্বন করে। আমাদের দেশে প্রেম প্রণয়ের নামগন্ধটী পর্য্যন্ত গুরুজনের সাম্‌নে হবার যো নাই।

এদের অনেক টাকা। অতি পরিষ্কার এবং কেতাদোরস্ত কাপড় না পর্‌লে সে ছোটলোক, তার সমাজে যাবার যো নাই। প্রত্যহ ধোপদস্ত কামিজ কলার প্রভৃতি দুবার তিনবার বদ্‌লাতে হবে ভদ্র-লোক্‌কে! গরীবরা অত শত পারে না। ওপরের কাপড়ে একটি দাগ, একটি কোঁচকা থাক্‌লেই মুস্কিল। নখের কোণে, হাতে, মুখে একটু ময়লা থাক্‌লেই মুস্কিল। গরমীতে পচেই মর আর যাই হক্‌, দস্তানা পরে যেতেই হবে, নইলে রাস্তায় হাত ময়লা হয় এবং সে হাত কোন স্ত্রীলোকের হাতে দিয়ে সম্ভাষণ করাটা অতি অভদ্রতা। ভদ্রসমাজে থুথু-ফেলা বা কুলকুচো করা বা দাঁত খোঁটা ইত্যাদি কর্‌লে তৎক্ষণাৎ চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি!!

পাশ্চাত্যধর্ম্ম শক্তিপূজা।

ধর্ম্ম এদের শক্তিপূজা, আদা বামাচার রকমের; পঞ্চ মকারের শেষ অঙ্গগুলো বাদ্‌ দিয়ে। "বামে বামা…দক্ষিণে পানপাত্রং…অগ্রে ন্যস্তং মরীচসহিতং

শূকরস্তোষ্ণমাংসং···কৌলো ধর্ম্মঃ পরমগহনো যোগী-নামপ্যগম্যঃ।” প্রকাশ্য, সর্ব্বসাধারণ, শক্তিপূজা বামাচার, মাতৃভাবও যথেষ্ট। প্রটেষ্টাণ্ট ত ইউ-রোপে নগণ্য—ধর্ম্ম ত ক্যাথলিক। সে ধর্ম্মে জিহোবা, যীশু, ত্রিমূর্ত্তি, সব অন্তর্দ্ধান, জেগে বসেছেন “মা”! শিশু-যীশু-কোলে “মা”। লক্ষ স্থানে, লক্ষ রকমে, লক্ষ রূপে, অট্টালিকায়, বিরাট্ মন্দিরে, পথপ্রান্তে, পর্ণকুটীরে “মা” “মা” “মা”! বাদ্‌সা ডাক্‌ছে “মা,” জঙ্গ বাহাদুর (Field-martial) সেনাপতি ডাক্‌ছে “মা,” ধ্বজা হস্তে সৈনিক ডাক্‌ছে “মা,” পোতবক্ষে নাবিক ডাক্‌ছে “মা,” জীর্ণবস্ত্র ধীবর ডাক্‌ছে “মা,” রাস্তার কোণে ভিখারি ডাক্‌ছে “মা”। “ধন্য মেরী,” “ধন্য মেরী” দিনরাত এ ধ্বনি উঠ্‌ছে।

আর মেয়ের পূজা। এ শক্তিপূজা কেবল কাম নয়, কিন্তু যে শক্তি পূজা, কুমারী সধবা পূজো, আমাদের দেশে কাশী কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থানে হয়, বাস্তবিক, প্রত্যক্ষ, কল্পনা নয়—সেই শক্তি-পূজা। তবে আমাদের পূজা ঐ তীর্থস্থানেই, সেই ক্ষণমাত্র; এদের দিনরাত, বারমাস। আগে

স্ত্রীলোকের আসন, আগে শক্তির বসন, ভূষণ, ভোজন, উচ্চ স্থান, আদর, খাতির। এ যে সে স্ত্রীলোকের পূজো, চেনা অচেনার পূজো, ভদ্রকুলের ত কথাই নাই, রূপসী যুবতীর ত কথাই নাই। এ পূজো ইউরোপে আরম্ভ করে মূরেরা, মুসলমান আরবমিশ্র মূরেরা, যখন তারা স্পেন বিজয় করে, আট শতাব্দী রাজত্ব করে সেই সময়। তাদের থেকে ইউরোপে সভ্যতার উন্মেষ, শক্তিপূজার অভ্যুদয়। মূর ভুলে গেল, শক্তিহীন শ্রীহীন হল। স্বস্থানচ্যুত হয়ে আফ্রিকার কোণে অসভ্যপ্রায় হয়ে বাস কর্‌তে লাগ্‌লো, আর সে শক্তির সঞ্চার হলো ইউরোপে; "মা" মুসলমান্‌কে ছেড়ে উঠলেন কৃশ্চানের ঘরে।

এ ইউরোপ কি? কালো, আদ্‌কালো, হল্‌দে, লাল, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকার সমস্ত মানুষ এদের পদানত কেন? এরা কেনই বা এ কলিযুগের একাধিপতি?

এ ইউরোপ বুঝ্‌তে গেলে, পাশ্চাত্য ধর্ম্মের আকর ফ্রান্স থেকে বুঝ্‌তে হবে। পৃথিবীর আধিপত্য ইয়ুরোপে, ইয়ুরোপের মহাকেন্দ্র পারি। পাশ্চাত্য সভ্যতা, রীতিনীতি, আলোক আঁধার, ভাল মন্দ,

ফ্রাঁস—পারি

সকলের শেষ পরিপুষ্ট ভাব এইখানে, এই পারি নগরীতে।

এ পারি এক মহাসমুদ্র—মণি, মুক্ত, প্রবাল যথেষ্ট, আবার মকর কুম্ভীরও অনেক। এই ফ্রান্স ইয়ুরোপের কর্ম্মক্ষেত্র। সুন্দর দেশ—চীনের কতক অংশ ছাড়া, এমন দেশ আর কোথাও নাই। নাতি-শীতোষ্ণ, অতি উর্ব্বরা, অতিবৃষ্টি নাই, অনাবৃষ্টিও নাই, সে নির্ম্মল আকাশ, মিঠে রৌদ্র, ঘাসের শোভা, ছোট ছোট পাহাড়, চিনার বাঁজ প্রভৃতি গাছ, ছোট ছোট নদী, ছোট ছোট প্রস্রবণ। সে জলে রূপ, স্থলে মোহ, বায়ুতে উন্মত্ততা, আকাশে আনন্দ। প্রকৃতি সুন্দর, মানুষও সৌন্দর্য্যপ্রিয়। আবালবৃদ্ধ-বনিতা, ধনী দরিদ্র, তাদের ঘর দোর ক্ষেত ময়দান, ঘসে মেজে, সাজিয়ে গুজিয়ে ছবিখানি করে রাখ্‌ছে। এক জাপান ছাড়া, এ ভাব আর কোথাও নাই। সে ইন্দ্রভুবন অট্টালিকাপুঞ্জ, নন্দনকানন উদ্যান, উপবন, মায় চাষার ক্ষেত, সকলের মধ্যে একটু রূপ, একটু সুচ্ছবি দেখবার চেষ্টা, এবং সফলও হয়েছে। এই ফ্রাঁস্ প্রাচীনকাল হতে গোলওয়া (Gaulois), রোমক, ফ্রাঁ (Franks)

প্রভৃতি জাতির সংঘর্ষভূমি; এই ফ্রাঁ জাতি রোম-সাম্রাজ্যের বিনাশের পর ইউরোপে একাধিপত্য লাভ কর্‌লে; এদের বাদ্‌সা শার্লামাঞন ইয়ুরোপে কৃশ্চান ধর্ম্ম তলওয়ারের দাপটে চালিয়ে দিলেন, এই ফ্রাঁ জাতি হতেই আসিয়াখণ্ডে ইয়ুরোপের প্রচার,—তাই আজও ইউরোপী আমাদের কাছে ফ্রাঁকি, ফেরিঙ্গি, প্লাঁকি, ফিলিঙ্গ, ইত্যাদি।

সভ্যতার আকর প্রাচীন গ্রীক ডুবে গেল, রাজ-চক্রবর্ত্তী রোম বর্ব্বর আক্রমণ-তরঙ্গে তলিয়ে গেল। ইয়ুরোপের আলো নিবে গেল, এদিকে আর এক অতি বর্ব্বরজাতির আসিয়াখণ্ডে প্রাদুর্ভাব হলো—আরব জাতি। মহাবেগে সে আরব-তরঙ্গ পৃথিবী ছাইতে লাগ্‌লো। মহাবল পারস্য আরবের পদানত হলো, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে হল, কিন্তু তার ফলে মুসলমান ধর্ম্ম আর একরূপ ধারণ কর্‌লে; সে আরবি ধর্ম্ম আর পারসীক সভ্যতা সম্মিলিত হলো।

আরবের তলওয়ারের সঙ্গে সঙ্গে পারস্য সভ্যতা ছড়িয়ে পড়্‌তে লাগলো। সে পারস্য সভ্যতা প্রাচীন গ্রীস্‌ ও ভারতবর্ষ হতে নেওয়া। পূর্ব্ব, পশ্চিম, দুদিক্‌ হতে মহাবলে মুসলমান তরঙ্গ

ইউরোপের উপর আঘাত করলে, সঙ্গে সঙ্গে বর্ব্বর অন্ধ ইউরোপে জ্ঞানালোক ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। প্রাচীন গ্রীকদের বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প, বর্ব্বরাক্রান্ত ইতালীতে প্রবেশ করলে, ধরা-রাজধানী রোমের মৃত-শরীরে প্রাণস্পন্দন হতে লাগলো—সে স্পন্দন ফ্লরেন্স নগরীতে প্রবল রূপ ধারণ করলে, প্রাচীন ইতালী নব জীবনে বেঁচে উঠতে লাগলো,—এর নাম রনেসাস্ (Renaissance), নব জন্ম। কিন্তু সে নবজন্ম হলো ইতালীর। ইউরোপের অন্যান্য অংশের তখন প্রথম জন্ম। সে কৃশ্চানী ষোড়শ শতাব্দীতে যখন আকবর, জাহাঁগির, সাজাহাঁ প্রভৃতি মোগল সম্রাট্ ভারতে মহাবল সাম্রাজ্য তুলেছেন, সেই সময় ইউরোপের জন্ম হল।

ইতালী বুড়ো জাত, একবার সাড়াশব্দ দিয়ে আবার পাশ ফিরে শুলো। সে সময় নানা কারণে ভারতবর্ষও জেগে উঠেছিল কিছু, আকবর হতে তিন পুরুষের রাজত্বে বিদ্যা বুদ্ধি শিল্পের আদর যথেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু অতি বৃদ্ধ জাত, নানাকারণে আবার পাশ ফিরে শুলো।

ইয়ুরোপে, ইতালীর পুনর্জন্ম গিয়ে লাগলো

বলবান্, অভিনব নূতন ফ্র্াঁ জাতিতে। চারিদিক্ হতে সভ্যতার ধারা সব এসে ফ্লরেন্স নগরীতে একত্র হয়ে নূতন রূপ ধারণ করলে; কিন্তু ইতালী জাতিতে সে বীর্য্য ধারণের শক্তি ছিল না, ভারতের মত সে উন্মেষ ঐখানেই শেষ হয়ে যেত, কিন্তু ইউরোপের সৌভাগ্য, এই নূতন ফ্র্াঁ জাতি আদরে সে তেজ গ্রহণ করলে। নবীন-রক্ত, নবীন জাত সে তরঙ্গে মহাসাহসে নিজের তরণী ভাসিয়ে দিলে, সে স্রোতের বেগ ক্রমশই বাড়তে লাগলো, সে এক ধারা শতধারা হয়ে বাড়তে লাগলো; ইউরোপের আর আর জাতি লোলুপ হয়ে খাল কেটে সে জল আপনার আপনার দেশে নিয়ে গেল এবং তাতে নিজেদের জীবনীশক্তি ঢেলে তার বেগ, তার বিস্তার বাড়াতে লাগলো; ভারতে এসে সে তরঙ্গ লাগলো; জাপান সে বন্যায় বেঁচে উঠলো সে জল পান করে মত্ত হয়ে উঠলো; জাপান এসিয়ার নূতন জাত।

এই পারি নগরী সে ইউরোপী সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ। এ বিরাট্ রাজধানী মর্ত্ত্যের অমরাবতী সদানন্দনগরী। এ ভোগ, এ বিলাস, এ আনন্দ

না লণ্ডনে, না বর্লিনে, না আর কোথায়। লণ্ডনে, নিউইয়র্কে ধন আছে; বর্লিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট; নেই সে ফরাসী মাটি, আর সর্ব্বাপেক্ষা নেই সে ফরাসী মানুষ। ধন থাক্, বিদ্যাবুদ্ধি থাক্, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও থাক্—মানুষ কোথায়? এ অদ্ভুত ফরাসী চরিত্র প্রাচীন গ্রীক্ মরে জন্মেছে যেন—সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছেবলা, আবার অতি গম্ভীর, সকল কাযে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ। কিন্তু সে নৈরাশ্য ফরাসী মুখে বেশীক্ষণ থাকে না, আবার জেগে ওঠে।

এই পারি বিশ্ববিদ্যালয় ইয়ুরোপের আদর্শ। দুনিয়ার বিজ্ঞান সভা এদের একাডেমির নকল; এই পারি ঔপনিবেশ সাম্রাজ্যের গুরু, সকল ভাষাতেই যুদ্ধশিল্পের সংজ্ঞা এখনও অধিকাংশ ফরাসী; এদের রচনার নকল, সকল ইয়ুরোপী ভাষায়; দর্শন বিজ্ঞান শিল্পের এই পারি খনি, সকল জায়গায় এদের নকল।

এরা হচ্ছে সহুরে, আর সব জাত যেন পাড়াগেঁয়ে। এরা যা করে, তা ৫০ বৎসর, ২৫ বৎসর পরে জর্ম্মাণ ইংরেজ প্রভৃতি নকল করে, তা বিদ্যায়

হক্, বা শিল্পে হক্, বা সমাজনীতিতেই হক্। এই ফরাসী সভ্যতা স্কট্‌লাণ্ডে লাগ্‌লো, স্কট্ রাজা ইংলণ্ডের রাজা হলেন, ফরাসী সভ্যতা ইংলণ্ডকে জাগিয়ে তুল্‌লে;—স্কটরাজ ষ্টুয়ার্ট বংশের সময় ইংলণ্ডে রয়াল সোসাইটি প্রভৃতির সৃষ্টি।

আর এই ফ্রান্স স্বাধীনতার আবাস। প্রজাশক্তি মহাবেগে এই পারিনগরী হতে ইয়ুরোপ তোলপাড় করে ফেলেছে, সেই দিন হতে ইয়ুরোপের নূতন মূর্ত্তি হয়েছে। সে এগালিতে, লিবার্ত্তে, ফ্রাতের্ণিতের (Egalite´ liberte´ fraternite´) ধ্বনি ফ্রান্স হতে চলে গেছে; ফ্রান্স অন্যভাব, অন্য উদ্দেশ্য অনুসরণ কর্‌ছে, কিন্তু ইয়ুরোপের অন্যান্য জাত এখনও সেই ফরাসী বিপ্লব মক্স করছে।

একজন স্কট্‌লাণ্ড দেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আমায় সেদিন বল্‌লেন যে, পারি হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র; যে দেশ যে পরিমাণে এই পারি নগরীর সঙ্গে নিজেদের যোগ স্থাপন কর্‌তে সক্ষম হবে, সে জাত তত পরিমাণে উন্নতি লাভ কর্‌বে। কথাট কিছু অতিরঞ্জিত সত্য; কিন্তু এ কথাটাও সত্য যে যদি কারু কোনও নূতন ভাব এ জগৎকে দেবার

থাকে, ত এই পারি হচ্ছে সে প্রচারের স্থান। এই পারিতে যদি ধ্বনি উঠে, ত ইউরোপ অবশ্যই প্রতিধ্বনি করবে। ভাস্কর, চিত্রকর, গাইয়ে, নর্ত্তকী এই মহানগরীতে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলে, আর সব দেশে সহজেই প্রতিষ্ঠা হয়।

আমাদের দেশে এ পারি নগরীর বদ্‌নামই শুনতে পাওয়া যায়,—এ পারি মহাকদর্য্য, বেশ্যাপূর্ণ নরককুণ্ড। অবশ্য এ কথা ইংরেজরাই বলে থাকে, এবং অন্য দেশের যে সব লোকের পয়সা আছে এবং জিহ্বোপস্থ ছাড়া দ্বিতীয় ভোগ জীবনে অসম্ভব, তারা অবশ্য বিলাসময় জিহ্বোপস্থের উপকরণময় পারিই দেখে।

কিন্তু লণ্ডন, বর্লিন, ভিয়েনা, নিউইয়র্কও ঐ বারবনিতাপূর্ণ, ভোগের উদ্যোগপূর্ণ; তবে তফাৎ এই, সে অন্য দেশের ইন্দ্রিয়চর্চ্চা পশুবৎ, পারিসের, সভ্য পারির ময়লা সোণার পাত মোড়া; বুনোশোরের পাঁকে লোটা, আর ময়ূরের পেখম-ধরা নাচে যে তফাৎ, অন্যান্য সহরের পৈশাচিক ভোগ আর এ পারিস বিলাসের সেই তফাৎ।

ভোগ বিলাসের ইচ্ছা কোন্ জাতে নেই বল?

নইলে দুনিয়ায় যার দুপয়সা হয়, সে অমনি পারি নগরী অভিমুখে ছোটে কেন? রাজা বাদসারা চুপি-সাড়ে নাম ভাঁড়িয়ে এ বিলাস-বিবর্ত্তে স্নান করে পবিত্র হতে আসেন কেন? ইচ্ছা সর্ব্বদেশে, উদ্যোগের ত্রুটি কোথাও কম দেখি না; তবে এরা সুসিদ্ধ হয়েছে, ভোগ কর্‌তে জানে, বিলাসের সপ্তমে পোঁছেছে।

তাও অধিকাংশ কদর্য্য নাচ তামাসা বিদেশীর জন্য; ফরাসী বড় সাবধান, বাজে খরচ করে না। এই ঘোর বিলাস, এই সব হোটেল, কাফে, যাতে এক-বার খেলে সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়, এ সব বিদেশী আহাম্মক ধনীদের জন্য। ফরাসীরা বড় সুসভ্য, আদব কায়দা বেজায়, খাতির খুব করে, পয়সা গুলি সব বার করে নেয়, আর মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাঁসে।

তা ছাড়া, আর এক তামাসা এই যে, আমেরিক, জর্ম্মাণ, ইংরেজ প্রভৃতির খোলা সমাজ, বিদেশী ঝাঁ করে সব দেখ্‌তে শুন্‌তে পায়। দু চার দিনের আলাপেই আমেরিক বাড়িতে দশ দিন বাস কর্ব্বার নিমন্ত্রণ করে; জর্ম্মাণ তদ্রূপ; ইংরেজ একটু

বিলম্বে। ফরাসী এ বিষয়ে বড় তফাৎ, পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত না হলে আর বাস কর্‌তে নিমন্ত্রণ করে না। কিন্তু যখন বিদেশী ঐ প্রকার সুবিধা পায়, ফরাসী পরিবার দেখবার জান্‌বার অবকাশ পায়, তখন আর এক ধারণা হয়। বলি, মেছ-বাজার দেখে অনেক বিদেশী যে আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে—সেটা কেমন আহাম্মকি। তেম্‌নি এ পারি। অবিবাহিতা মেয়ে এদেশে আমাদের দেশের মত সুরক্ষিতা, তারা সমাজে প্রায় মিশতে পায় না। বের পর তবে নিজের স্বামীর সঙ্গে সমাজে মেশে। বে থা মায়ে বাপে দেয়, আমাদের মত। আর এরা আমোদপ্রিয়, কোনও বড় সামাজিক ব্যাপার নর্ত্তকীর নাচ না হলে সম্পূর্ণ হয় না। যেমন আমাদের বে পূজো সর্ব্বত্রে নর্ত্তকীর আগমন। ইংরেজ ওলবাটা-মুখ, অন্ধকার দেশে বাস করে, সদা নিরানন্দ, ওদের মতে এ বড় অশ্লীল, কিন্তু থিয়েটারে হলে আর দোষ নাই। একথাটাও বলি যে, এদের নাচটা আমাদের চখে অশ্লীল বটে, তবে এদের সয়ে গেছে। নেংটি নাচ সর্ব্বত্রে, ও গ্রাহ্যর মধ্যেই নয়। কিন্তু ইংরেজ

আমেরিকান দেখতেও ছাড়বে না, আর ঘরে গিয়ে গাল দিতেও ছাড়বে না।

স্ত্রী সম্বন্ধী আচার।

স্ত্রী সম্বন্ধী আচার পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই একরূপ, অর্থাৎ পুরুষ মানুষের অন্য স্ত্রীসংসর্গে বড় দোষ হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলাটায় মুস্কিল। তবে ফরাসী পুরুষ একটু খোলা, অন্য দেশের ধনী লোকেরা যেমন এ সম্বন্ধে বেপরোয়া তেম্‌নি। আর ইউরোপী পুরুষসাধারণ ও বিষয়টা অত দোষের ভাবে না। অবিবাহিতের ও বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে বড় দোষের নয়; বরং বিদ্যার্থী যুবক ও বিষয়ে একান্ত বিরত থাক্‌লে, অনেক স্থলে তার মা বাপ দোষাবহ বিবেচনা করে; পাছে ছেলেটা "মেনিমুখো" হয়। পুরুষের এক গুণ পাশ্চাত্য দেশে চাই—সাহস; এদের "ভার্চ্চু" (Virtue) শব্দ আর আমাদের "বীরত্ব" একই শব্দ। ঐ শব্দের ইতিহাসেই দেখ, এরা কাকে পুরুষের সততা বলে। মেয়ে মানুষের পক্ষে সতীত্ব অত্যাবশ্যক বটে।

এ সকল কথা বল্‌বার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক জাতির এক একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে, সেইখানটা হতে সে জাতির রীতিনীতি বিচার কর্‌তে

হবে। তাদের চখে তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের চক্ষে আমাদের দেখা, এ তুই ভুল।

আমাদের উদ্দেশ্য এ বিষয়ে এদের ঠিক উল্টা, আমাদের ব্রহ্মচারী (বিত্থার্থী) শব্দ আর কামজয়িত্ব এক। বিত্থার্থী আর কামজিৎ একই কথা।

আমাদের উদ্দেশ্য মোক্ষ। ব্রহ্মচর্য্য বিনা তা কেমনে হয় বল ? এদের উদ্দেশ্য ভোগ, ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যক তত নাই ; তবে স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ হলে ছেলে পিলে জন্মায় না এবং সমগ্র জাতির ধ্বংস। পুরুষ মানুষে দশ গণ্ডা বে কর্‌লে তত ক্ষতি নাই, বরং বংশ বৃদ্ধি খুব হয়। স্ত্রীলোকের একটা ছাড়া আর একটা এক সঙ্গে চলে না—ফল বন্ধ্যাত্ব। কাযেই সকল দেশে স্ত্রীলোকের সতীত্বের উপর বিশেষ আগ্রহ, পুরুষের বাড়ার ভাগ। "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।"

যাক, মোদ্দা এমন সহর আর এ ভূমণ্ডলে নাই। পূর্ব্বকালে এ সহর ছিল আর একরূপ, ঠিক আমাদের কাশীর বাঙ্গালীটোলার মত। আঁকা বাঁকা গলি রাস্তা, মাঝে মাঝে তুটো বাড়ি এক করা খিলান,

দেলের গায়ে পাত্‌কো, ইত্যাদি। এবারকার এক্‌-জিবিষনে একটা ছোট পুরাণ পারি তৈরি করে দেখিয়েছে। সে পারি কোথায় গেছে, ক্রমিক বদ্‌লেছে, এক একবার লড়াই বিদ্রোহ হয়েছে, কতক অংশ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, আবার পরিষ্কার নূতন ফর্‌দা পারি সেই স্থানে উঠেছে।

বর্ত্তমান পারি অধিকাংশই তৃতীয় ন্যাপোলেঅঁর তৈরি। তৃ-ন্যাপোলেঅঁ মেরে কেটে জুলুম করে বাদ্‌সা হলেন। ফরাসী সেই প্রথম বিপ্লব হওয়া অবধি সতত টলমল্‌; কাযেই বাদ্‌সা, প্রজাদের খুসী রাখবার জন্য, আর পারি-নগরীর সতত চঞ্চল গরীব লোকদের কায দিয়ে খুসী করবার জন্য, ক্রমাগত রাস্তা ঘাট তোরণ থিয়েটার প্রভৃতি গড়্‌তে লাগলেন। অবশ্য পারির সমস্ত পুরাতন মন্দির তোরণ স্তম্ভ প্রভৃতি রৈল। রাস্তা ঘাট সব নূতন হয়ে গেল। পুরাণ সহর—পগার পাঁচিল সব ভেঙ্গে বুলভারের অভ্যুদয় হতে লাগ্‌লো, এবং তাঁ হতেই এ সহরের সর্ব্বোত্তম রাস্তা, পৃথিবীতে অদ্বিতীয় শাঁজেলিজে রাস্তা তৈরি হল। এ রাস্তা এত বড় চওড়া যে, মধ্যখানে, এবং দুপাশ দিয়ে বাগান চলেছে এবং এক স্থানে অতি

বৃহৎ গোলাকার হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার নাম প্লাস্ দ লা কনকর্দ, (Place de la concorde.) এই প্লাস্ দ লা কনকর্দের চারিদিকে প্রায় সমান্তরালে ফ্রাঁসের প্রত্যেক জেলার এক এক যান্ত্রিক নারীমূর্ত্তি। তার মধ্যে একটি মূর্ত্তি হচ্ছে ষ্ট্রাস্-বুর্গ নামক জেলার। ঐ জেলা এখন ডইচ্ (জর্ম্মান্) রা ১৮৭২ সালের লড়াইয়ের পর হতে কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু সে দুঃখ ফাঁসের আজও যায় না, সে মূর্ত্তি দিন রাত প্রেতোদ্দিষ্ট ফুলমালায় ঢাকা। যে রকমের মালা লোকে আত্মীয় স্বজনের গোরের উপর দিয়ে আসে, সেই রকম বৃহৎ বৃহৎ মালা দিন রাত সে মূর্ত্তির উপর কেউ না কেউ দিয়ে যাচ্ছে।

দিল্লির চাঁদনিচৌক কতক অংশে এই প্লাস্ দ লা কনকর্দের মত এককালে ছিল বলে বোধ হয়। স্থানে স্থানে জয়স্তম্ভ, বিজয় তোরণ আর বিরাট্ নরনারী সিংহাদি ভাস্কর্য্য মূর্ত্তি। মহাবীর প্রথম ন্যাপোলেঅঁর স্মারক এক সুবৃহৎ ধাতুনির্ম্মিত বিজয়-স্তম্ভ। তার গায়ে ন্যাপোলেঅঁর সময়ের যুদ্ধ বিজয় অঙ্কিত। উপরে তাঁর মূর্ত্তি। আর একস্থানে প্রাচীন দুর্গ বাস্তিল (Bastille) ধ্বংসের স্মারক চিহ্ন। তখন

রাজাদের একাধিপত্য ছিল, যাকে তাকে যখন তখন জেলে পুরে দিত। বিচার না, কিছু না, রাজা এক হুকুম লিখে দিতেন; তার নাম লেটর্ দ ক্যাশে—মানে রাজমুদ্রাঙ্কিত লিপি। তার পর, সে ব্যক্তি আর কি করেছে কি না, দোষী কি নির্দ্দোষী, তার আর জিজ্ঞাসা-পড়া নেই, একেবারে নিয়ে পুরলে সেই বাস্তিলে;—সেখান থেকে বড় কেউ আর বেরুত না। রাজাদের প্রণয়িনীরা কারুর উপর চট্‌লে, রাজার কাছ থেকে ঐ শীলটা করিয়ে নিয়ে সে ব্যক্তিকে বাস্তিলে ঠেলে দিত। পরে যখন দেশ শুদ্ধ লোক এ সব অত্যাচারে ক্ষেপে উঠলো, ব্যক্তি-গত স্বাধীনতা, সব সমান, ছোট বড় কিছুই নয়,—এ ধ্বনি উঠাল, পারির লোক উন্মত্ত হয়ে রাজা-রাণীকে আক্রমণ কর্‌লে, সে সময় প্রথমেই এ মানুষের অত্যাচারের ঘোর নিদর্শন বাস্তিল ভূমিসাৎ কর্‌লে, সে স্থানটায় এক রাত ধরে নাচ গান আমোদ কর্‌লে। তার পর, রাজা পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ধরে ফেল্‌লে, রাজার শ্বশুর অষ্ট্রি-য়ার বাদ্‌সা জামায়ের সাহায্যে সৈন্য পাঠাচ্ছেন শুনে প্রজারা ক্রোধে অন্ধ হয়ে রাজারাণীকে মেরে

ফেল্‌লে, দেশশুদ্ধ লোকে স্বাধীনতা সাম্যের নামে মেতে উঠ্‌লো, ফ্রাঁস প্রজাতন্ত্র হল, অভিজাত ব্যক্তির মধ্যে যাকে ধর্‌তে পার্‌লে তাকেই মেরে ফেল্‌লে, কেউ কেউ উপাধি টুপাধি ছেড়ে প্রজার দলে মিশে গেল। শুধু তাই নয়, বল্‌লে, "দুনিয়া শুদ্ধ লোক তোমরা ওঠ, রাজা ফাজা অত্যাচারী সব মেরে ফেল, সব প্রজা স্বাধীন হক, সকলে সমান হক।" তখন ইউরোপ শুদ্ধ রাজারা ভয়ে অস্থির হয়ে উঠ্‌লো— এ আগুন পাছে নিজেদের দেশে লাগে, পাছে নিজে-দের সিংহাসন গড়িয়ে পড়ে যায়, তাই তাকে নেবাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে চারিদিক্ থেকে ফ্রাঁস আক্রমণ কর্‌লে। এদিকে প্রজাতন্ত্রের কর্তৃ-পক্ষেরা "লা পাত্রি আ দাঁজে"—"জন্মভূমি বিপদে," এই ঘোষণা করে দিলে; সে ঘোষণা আগুনের মত দেশময় ছড়িয়ে পড়্‌লো। ছেলে বুড়ো, মেয়ে মদ্দে "মার্সাইএ" মহাগীত গাইতে গাইতে, উৎসাহ-পূর্ণ ফ্রাঁসের মহাগীত গাইতে গাইতে, দলে দলে, জীর্ণবসন, সে শীতে নগ্নপদ, অত্যল্পান্ন ফরাসী প্রজা ফৌজ বিরাট্ সমগ্র ইউরোপী চমূর সম্মুখীন হল, বড় ছোট ধনী দরিদ্র সব বন্দুক ঘাড়ে বেরুল—

পরিত্রাণায়……বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং বেরুল। সমগ্র ইউরোপ সে বেগ সহ্য করতে পারলে না। ফরাসী জাতির অগ্রে সৈন্যদের স্কন্ধে দাঁড়িয়ে এক বীর,—তাঁর অঙ্গুলি হেলনে ধরা কাঁপতে লাগল, তিনিই ন্যাপোলেঅঁ।

স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, বন্দুকের নালমুখে, তলওয়ারের ধারে ইউরোপের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়ে দিলে, তিন-রঙ্গা ককার্ডের জয় হল। তার পর, ন্যপোলেঅঁ ফ্রাঁস মহারাজ্যকে দৃঢ়বদ্ধ সাবয়ব করবার জন্য বাদসা হলেন। তার পর তাঁর কার্য্য শেষ হল, ছেলে হলনা বলে সুখ দুঃখের সঙ্গিনী ভাগ্যলক্ষ্মী রাজ্ঞী জোসেফিন্‌কে ত্যাগ করলেন, অষ্ট্রিয়ার বাদসার মেয়ে বে করলেন। জোসেফিনের সঙ্গে সঙ্গে সে ভাগ্য ফিরলো, রুষ জয় কর্ত্তে গিয়ে বরফে তাঁর ফৌজ মারা গেল। ইউরোপ বাগ্ পেয়ে, তাঁকে জোর করে সিংহাসন ত্যাগ করিয়ে একটা দ্বীপে পাঠিয়ে দিলে, পুরাণ রাজার বংশের একজনকে তক্তে বসালে।

মরা সিঙ্গি সে দ্বীপ থেকে পালিয়ে আবার ফ্রাঁসে হাজির হল, ফ্রাঁস শুদ্ধ লোক আবার তাঁকে মাথায়

করে নিলে, রাজা পালাল; কিন্তু অদৃষ্ট ভেঙ্গেছে, আর যুড়্‌লো না—আবার ইউরোপ শুদ্ধ পড়ে, তাঁকে হারিয়ে দিলে। ন্যাপোলেঅঁ ইংরেজদের এক জাহাজে উঠে শরণাগত হলেন; ইংরাজেরা তাঁকে সেণ্ট হেলেনা নামক দূর একটা দ্বীপে বন্দী রাখ্‌লে আমরণ। আবার পুরাণ রাজা এল, তাঁর ভাইপো রাজা হল। আবার ফ্রাঁসের লোক ক্ষেপে উঠ্‌লো, রাজা ফাজা তাড়িয়ে দিলে, আবার প্রজাতন্ত্র হল। মহাবীর ন্যাপোলেঅঁর এক ভাইপো এ সময় ক্রমে ফ্রাঁসের প্রীতিপাত্র হলেন, ক্রমে একদিন ষড়যন্ত্র করে নিজেকে বাদ্‌সা ঘোষণা কর্‌লেন। তিনি ছিলেন তৃতীয় ন্যাপোলেঅঁ; দিন কতক তাঁর খুব প্রতাপ হল। কিন্তু জর্ম্মাণ যুদ্ধে হেরে তাঁর সিংহাসন গেল, আবার ফ্রাঁস প্রজাতন্ত্র হল। সেই অবধি প্রজাতন্ত্র চলেছে।

ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের মূলভিত্তিস্বরূপ পরিণামবাদ। (Evolution Theory)

যে পরিণাম-বাদ ভারতের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মূলভিত্তি, এখন সে পরিণাম-বাদ ইউরোপী বহির্বিজ্ঞানে প্রবেশ করেছে। ভারত ছাড়া অন্যত্র সকল দেশের ধর্ম্মে ছিল এই যে, দুনিয়াটা সব টুক্‌রা টুক্‌রা, আলাদা আলাদা। ঈশ্বর একজন আলাদা,

প্রকৃতি একটা আলাদা, মানুষ একটা আলাদা, ঐ রকম পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, গাছ, পালা, মাটি, পাথর, ধাতু প্রভৃতি সব আলাদা আলাদা। ভগবান্ ঐ রকম আলাদা আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন।

জ্ঞান মানে কি না বহুর মধ্যে এক দেখা। যে গুলো আলাদা, তফাৎ বলে আপাততঃ বোধ হচ্ছে, তাদের মধ্যে ঐক্য দেখা। যে সম্বন্ধে এই ঐক্য মানুষ দেখ্‌তে পায়, সেই সম্বন্ধটাকে "নিয়ম" বলে; এরি নাম প্রাকৃতিক নিয়ম।

পূর্ব্বে বলেছি যে, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্ম্মে। আর পাশ্চাত্যে ঐ সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে, সমাজে। ভারতবর্ষে চিন্তাশীল মনীষীরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, ও আলাদা ভাবটা ভুল; ও সব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে, মাটি, পাথর, গাছ, পালা, জন্তু, মানুষ, দেবতা, এমন কি ঈশ্বর স্বয়ং, এর মধ্যে ঐক্য রয়েছে, অদ্বৈতবাদী এর চরম সীমায় পৌঁছুলেন, বল্লেন যে, সমস্তই সেই একের বিকাশ। বাস্তবিক এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত জগৎ এক, তার নাম

"ব্রহ্ম"; আর ঐ যে আলাদা আলাদা বোধ হচ্ছে, ওটা ভুল, ওর নাম দিলেন "মায়া", "অবিদ্যা" অর্থাৎ অজ্ঞান। এই হলো জ্ঞানের চরম সীমা।

ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে দাও, বিদেশে যদি এ কথাটা এখন কেউ বুঝতে না পারে, ত তাকে আর পণ্ডিত কি করে বলি। মোদ্দা এদের অধিকাংশ পণ্ডিতই এটা এখন বুঝেছে, এদের রকম দিয়ে,—জড় বিজ্ঞানের ভেতর দিয়ে। তা সে এক কেমন করে বহু হল, এ কথা আমরাও বুঝি না, এরাও বোঝে না। আমরাও সিদ্ধান্ত করে দিয়েছি যে, ওখানটা বুদ্ধির অতীত। এরাও তাই করেছে। তবে সেই এক কি কি রকম হয়েছে, কি কি রকম জাতিত্ব ব্যক্তিত্ব পাচ্ছে, এটা বোঝা যায় এবং এইটার খোঁজের নাম বিজ্ঞান (Science)।

কাযেই এখন এদেশে প্রায় সকলেই পরিণামবাদী,—Evolutionist। যেমন ছোট জানোয়ার বদ্‌লে বদ্‌লে বড় জানোয়ার হচ্ছে, বড় জানোয়ার কখন কখন ছোট হচ্ছে, লোপ পাচ্ছে; তেম্‌নি মানুষ যে একটা সুসভ্য অবস্থায় দুম্ করে জন্ম পেলে, এ কথা আর কেউ বড় বিশ্বাস কর্‌ছে না। বিশেষ এদের

পাশ্চাত্য মতে সমাজের ক্রমবিকাশ।

বাপ্‌ দাদা, কাল্‌ না পরশু, বর্ব্বর ছিল, তা থেকে অল্প দিনে এই কাণ্ড। কাযেই এরা বল্‌ছে যে, সমস্ত মানুষ ক্রমে ক্রমে অসভ্য অবস্থা থেকে উঠেছে এবং উঠ্‌ছে। আদিম মানুষ কাঠ পাথরের যন্ত্র তন্ত্র দিয়ে কায চালাত, চাম্‌ড়া বা পাতা পরে দিন কাটাত, পাহাড়ের গুহায় বা পাখীর বাসার মত কুঁড়ে ঘরে গুজ্‌রান্‌ কর্‌ত। এর নিদর্শন সর্ব্বদেশের মাটির নীচে পাওয়া যাচ্ছে এবং কোনও কোনও স্থলে সে অবস্থার মানুষ স্বয়ং বর্ত্তমান। ক্রমে মানুষ ধাতু ব্যবহার কর্‌তে শিখলে, সে নরম ধাতু—টিন্‌ আর তামা। তাকে মিশিয়ে যন্ত্রতন্ত্র অস্ত্রশস্ত্র কর্‌তে শিখলে। প্রাচীন গ্রীক, বাবিল, মিশরীরাও অনেক দিন পর্য্যন্ত লোহার ব্যবহার জান্‌ত না, যখন তারা অপেক্ষাকৃত সভ্য হয়েছিল, বই পত্র পর্য্যন্ত লিখতো, সোণা রূপো ব্যবহার করত, তখন পর্য্যন্ত। আমেরিকা মহাদ্বীপের আদিম নিবাসীদের মধ্যে মেক্সিকো পেরু মায়া প্রভৃতি জাতি অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ছিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ কর্‌ত, সোণা রূপোর খুব ব্যবহার ছিল (এমন কি ঐ সোণা রূপোর লোভেই স্পানি লোকেরা তাদের ধ্বংস সাধন

কর্‌লে)। কিন্তু সে সমস্ত কায চক্‌মকি পাথরের অস্ত্রদ্বারা অনেক পরিশ্রমে কর্‌তো, লোহার নাম গন্ধও জান্‌তো না।

আদিম অবস্থায় মানুষ মৃগয়াজীবী।

আদিম অবস্থায় মানুষ তীর ধনুক বা জালাদি উপায়ে জন্তু জানোয়ার মাছ মেরে খেত, ক্রমে চাষ বাস শিখ্‌লে, পশুপালন কর্‌তে শিখ্‌লে। বনের জানোয়ারকে বশে এনে নিজের কায করাতে লাগ্‌লো। অথবা সময়মত আহারেরও জন্য জানোয়ার পাল্‌তে লাগ্‌লো। গরু, ঘোড়া, শূকর, হাতি, উট, ভেড়া, ছাগল, মুরগি প্রভৃতি পক্ষী মানুষের গৃহ-পালিত হতে লাগ্‌লো। এর মধ্যে কুকুর হচ্ছেন মানুষের আদিম বন্ধু।

পরে কৃষিজীবী।

আবার চাষ বাস আরম্ভ হলো। যে ফল মূল শাক সব্‌জি ধান চাল মানুষে খায়, তার বুনো অবস্থা আর এক রকম। এ মানুষের যত্নে বুনো ফল, বুনো ঘাস নানাপ্রকার সুখাদ্য বৃহৎ ও উপাদেয় ফলে পরিণত হলো। প্রকৃতিতে আপনা আপনি দিন রাত অদল বদল ত হচ্ছেই। নানাজাতের বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী শরীরসংসর্গে দেশ-কাল-পরিবর্ত্তনে নবীন নবীন জাতির সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু মানুষ-সৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত

প্রকৃতি ধীরে ধীরে তরু লতা জীব জন্তু বদ্‌লাচ্ছিলেন, মানুষ জন্মে অবধি সে হুড়মুড় করে বদ্‌লে দিতে লাগ্‌লো। সাঁ সাঁ করে একদেশের গাছ পালা জীব জন্তু অন্য দেশে মানুষ নিয়ে যেতে লাগ্‌লো, তাদের পরস্পর মিশ্রণে নানাপ্রকার অভিনব জীবজন্তুর, গাছপালার জাত মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হতে লাগ্‌লো।

বিবাহের আদিতত্ত্ব।

আদিম অবস্থায় বিবাহ থাকে না, ক্রমে ক্রমে যৌন সম্বন্ধ উপস্থিত হল। প্রথম বৈবাহিক সম্বন্ধ সর্ব্বসমাজে "মা"য়ের উপর ছিল। বাপের বড় ঠিকানা থাক্‌তো না। মায়ের নামে ছেলে পুলের নাম হত। মেয়েদের হাতে সমস্ত ধন থাক্‌তো, ছেলে মানুষ করবার জন্য। ক্রমে ধন পত্র পুরুষের হাতে গেল, মেয়েরাও পুরুষের হাতে গেল। পুরুষ বল্লে, "যেমন এ ধন ধান্য আমার, আমি চাষ বাস করে বা লুঠ তরাজ করে উপার্জ্জন করেছি, এতে যদি কেউ ভাগ বসায়, ত আমি বিরোধ কর্‌বো," তেম্‌নি বল্লে, "এ মেয়েগুলো আমার, এতে যদি কেউ হস্তার্পণ করে, ত বিরোধ হবে।" বর্ত্তমান বিবাহের সূত্রপাত হলো। মেয়ে মানুষ, পুরুষের ঘটি বাটি গোলাম প্রভৃতি অধিকারের ন্যায় হলো।

প্রাচীন রীতি—একদলের পুরুষ অন্যদলে বে করত। সে বিবাহও জবরদস্তি মেয়ে ছিনিয়ে এনে। ক্রমে সে কাড়াকাড়ি বদ্‌লে গেল, স্বেচ্ছায় বিবাহ চল্‌লো; কিন্তু সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস থাকে। এখনও প্রায় সর্ব্বদেশে বরকে একটা নকল আক্রমণ করে। বাঙ্গালাদেশে, ইউরোপে, চাল দিয়ে বরকে আঘাত করে, পশ্চিমাঞ্চলে কনের আত্মীয় মেয়েরা বরযাত্রীদের গালি গালাজ করে ইত্যাদি।

সমাজ সৃষ্টি হইতে লাগ্‌ল। দেশভেদে সমাজের সৃষ্টি। সমুদ্রের ধারে যারা বাস কর্‌তো, তারা অধিকাংশই মাছ ধরে জীবিকা কর্‌তো; যারা সমতল জমীতে, তাদের চাষবাস; যারা পার্ব্বত্য দেশে, তারা ভেড়া চরাত; যারা মরুময়-দেশে, তারা ছাগল, উট চরাতে লাগ্‌ল। কতকদল জঙ্গলের মধ্যে বাস করে, শীকার করে খেতে লাগ্‌লো। যারা সমতল দেশ পেলে, চাষবাস শিখ্‌লে, তারা পেটের দায়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চিন্তা করবার অবকাশ পেলে, তারা অধিকতর সভ্য হতে লাগ্‌ল। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শরীর দুর্ব্বল হতে লাগ্‌ল। যাদের শরীর দিন রাত খোলা হাওয়ায়

কৃষিজীবী দেব ও মৃগয়াজীবী অসুরের সম্বন্ধ।

বাস করে, মাংস প্রধান আহার, তাদের, আর যারা ঘরের মধ্যে বাস করে, শস্যপ্রধান আহার, অনেক পার্থক্য হতে লাগলো। শিকারী বা পশুপাল বা মৎস্যজীবী, আহারের অনাটন হলেই, ডাকাত বা বোম্বেটে হয়ে সমতলবাসীদের লুটতে আরম্ভ কর্‌লে। সমতলবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য, ঘনদলে সন্নিবিষ্ট হতে লাগ্‌লো, ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হতে লাগ্‌লো।

দেবতারা ধান চাল খায়, সুসভ্য অবস্থা, গ্রাম, নগর, উদ্যানে বাস, পরিধান বোনা কাপড়; আর অসুরদের পাহাড়, পর্ব্বত, মরুভূমি বা সমুদ্র-তটে বাস, আহার বন্য জানোয়ার, বন্য ফলমুল, পরিধান ছাল; আর বুনো জিনিস্ বা ভেড়া ছাগল গরু দেবতাদের কাছ থেকে, বিনিময়ে যা ধান চাল। দেবতার শরীর শ্রম সহিতে পারে না, দুর্ব্বল। অসুরের শরীর উপবাস, কৃচ্ছ্র, কষ্ট সহনে বিলক্ষণ পটু।

অসুরের আহারাভাব হলেই, দল বেঁধে পাহাড় হতে, সমুদ্রকূল হতে, গ্রাম নগর লুঠতে এলো। কখনও বা ধন ধানের লোভে দেবতাদের আক্রমণ

কর্‌তে লাগ্‌লো। দেবতারা বহুজন একত্র না হতে পার্‌লেই অসুরের হাতে মৃত্যু। আর দেবতার বুদ্ধি প্রবল হয়ে নানাপ্রকার যন্ত্র তন্ত্র নির্ম্মাণ কর্‌তে লাগ্‌লো। ব্রহ্মাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, শৈবাস্ত্র সব দেবতাদের; অসুরের সাধারণ অস্ত্র, কিন্তু গায়ে বিষম বল। বারম্বার অসুর দেবতাদের হারিয়ে দেয়, কিন্তু অসুর সভ্য হতে জানে না, চাষবাস কর্‌তে পারে না, বুদ্ধি চালাতে জানে না। বিজয়ী অসুর যদি বিজিত দেবতাদের স্বর্গে রাজ্য কর্‌তে চায়, ত সে কিছুদিনের মধ্যে দেবতাদের বুদ্ধি-কৌশলে দেবতাদের দাস হয়ে পড়ে থাকে। নতুবা অসুর লুঠ করে সরে আপনার স্থানে যায়। দেবতারা যখন একত্রিত হয়ে, অসুরদের তাড়ায়, তখন, হয় তাদের সমুদ্র মধ্যে তাড়ায়, না হয় পাহাড়ে না হয় জঙ্গলে তাড়িয়ে দেয়। ক্রমে দু দিকেই দল বাড়্‌তে লাগ্‌লো, লক্ষ লক্ষ দেবতা একত্র হতে লাগ্‌লো, লক্ষ লক্ষ অসুর একত্র হতে লাগ্‌লো। মহা সংঘর্ষ, মেশা-মিশি, জেতাজিতি, চল্‌তে লাগ্‌লো। এ সব রকমের মানুষ মিলে মিশে বর্ত্তমান সমাজ, বর্ত্তমান প্রথা সকলের সৃষ্টি হতে লাগ্‌লো। নানা রকম নূতন

ভাবের সৃষ্টি হতে লাগ্‌লো, নানা বিদ্যার আলোচনা চল্‌লো। একদল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগ্‌ল—হাত দিয়ে বা বুদ্ধি করে। একদল সেই সব ভোগ্যদ্রব্য রক্ষা করতে লাগ্‌লো। সকলে মিলে সেই সব বিনিময় করতে লাগ্‌লো। আর মাঝ-খান্ থেকে একদল ওস্তাদ্, এ জায়গার জিনিষটা ও জায়গায় নিয়ে যাবার বেতন স্বরূপ, সমস্ত জিনিষের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখ্‌লে। একজন চাষ কর্‌লে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিন্‌লে। যে চাষ কর্‌লে, সে পেলে ঘোঁড়ার ডিম; যে পাহারা দিলে, সে জুলুম করে কতকটা আগ ভাগ নিলে; অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিন্‌লে, সে এ সকলের দাম দিয়ে মলো!! পাহারাওয়ালার নাম হলো রাজা, মুটের নাম হলো সওদাগর। এ দু দল কাজ কর্‌লে না—ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগলো। যে জিনিষ তৈরি করতে লাগ্‌ল, সে পেটে হাত দিয়ে হা ভগবান্ ডাক্‌তে লাগ্‌লো।

রাজা বণিক্-প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি রহস্য।

ক্রমে এই সকল ভাব প্যাঁচাপেঁচি, মহা গেরোর উপর গেরো, তস্য গেরো হয়ে, বর্ত্তমান মহা জটিল

সমাজ উপস্থিত হলেন। কিন্তু ছিট্ মরে না। যে গুলো পূর্ব্ব জন্মে ভেড়া চরাত, মাছ ধরে খেত, সে গুলো সভ্য জন্মে বম্বেটে, ডাকাত প্রভৃতি হতে লাগ্‌লো। বন নাই যে সে শিকার করে; কাছে পাহাড় পর্ব্বতও নাই, যে ভেড়া চরায়; জন্মের দরুণ শিকার বা ভেড়া চরাণ বা মাছ ধরা কোনটারই সুবিধা পায় না—সে কাযেই ডাকাতি করে, চুরি করে, সে যায় কোথা? সে প্রাতঃস্মরণীয়াদের কালের মেয়ে, এ জন্মে ত আর এক সঙ্গে অনেক বর বে করতে পায় না, কাযেই হয় বেশ্যা। ইত্যাদি রকমে নানা ঢঙ্গের, নানা ভাবের, নানা সভ্য অসভ্য দেবতা অসুর জন্মের মানুষ একত্র হয়ে হয়েছে সমাজ। কাযেই সকল সমাজে এই নানারূপে ভগবান্ বিরাজ কচ্ছেন। সাধু নারায়ণ, ডাকাত নারায়ণ, ইত্যাদি। আবার যে সমাজে যে দলে সংখ্যায় অধিক, সে সমাজের চরিত্র সেই পরিমাণে দৈবী বা আসুরী হতে লাগ্‌লো।

দস্যু ও বেশ্যার উৎপত্তি।

জম্বুদ্বীপের তামাম্ সভ্যতা—সমতল ক্ষেত্রে, বড় বড় নদীর উপর, অতি উর্ব্বর ভূমিতে উৎপন্ন—ইয়ংচিকিয়ং, গঙ্গা, সিন্ধু, ইউফ্রেটিস্‌তীর। এ সকল

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন ভিত্তি।

সভ্যতারই আদ্ ভিত্তি চাস্ বাস। এ সকল সভ্যতাই দেবতাপ্রধান। আর ইউরোপের সকল সভ্যতাই প্রায় পাঁহাড়ে, না হয় সমুদ্রময় দেশে জন্মেছে—ডাকাত আর বম্বেটে এ সভ্যতার ভিত্তি, এতে অসুর ভাব অধিক।

বর্ত্তমান কালে যতদূর বোঝা যায়, জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগ ও আরবের মরুভূমি অসুরদের প্রধান আড্ডা। ঐ স্থান হতে একত্র হয়ে, পশুপাল, মৃগয়া-জীবী অসুরকুল, সভ্য দেবতাদের তাড়া দিয়ে, দুনিয়া-ময় ছড়িয়ে দিয়েছে।

ইয়ুরোপখণ্ডের আদিমনিবাসী এক জাত অবশ্য ছিল। তারা পর্ব্বতগহ্বরে বাস করতো; যারা ওর মধ্যে একটু বুদ্ধিমান্, তারা অল্প গভীর তলাওয়ের জলে খোঁটা পুতে, মাচান বেঁধে, সেই মাচানের উপর ঘর দোর নির্ম্মাণ করে বাস করতো। চক্‌মকি পাথরের তীর, বর্ষার ফলা, চক্‌মকির ছুরি ও পরশু দিয়ে সমস্ত কাষ চালাত।

ক্রমে জম্বুদ্বীপের নরস্রোত ইউরোপের উপর পড়তে লাগ্‌লো। কোথাও কোথাও অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতের অভ্যুদয় হলো; রুষদেশান্তর্গত

কোনও জাতির ভাষা, ভারতের দক্ষিণি ভাষার অনুরূপ।

গ্রীক।

কিন্তু এ সকল জাত বর্ব্বর, অতি বর্ব্বর অবস্থায় রইল। এসিয়া মিনর হতে একদল সুসভ্য মানুষ সন্নিকট দ্বীপপুঞ্জে উদয় হল, ইউরোপের সন্নিকট স্থান অধিকার করলে, নিজেদের বুদ্ধি আর প্রাচীন মিসরের সাহায্যে এক অপূর্ব্ব সভ্যতা সৃষ্টি করলে; তাদের আমরা বলি যবন, ইউরোপীরা বলে গ্রীক।

ইউরোপী জাতের সৃষ্টি।

পরে ইতালিতে রোমক নামক অন্য এক বর্ব্বর জাতি, ইট্রস্কান্ নামক এক সভ্য জাতিকে পরাভূত করে, তাদের বুদ্ধি বিদ্যা সংগ্রহ করে নিজেরা সভ্য হলো। ক্রমে রোমকেরা চারিদিক্ অধিকার করলে; ইয়ুরোপ খণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগের যাবতীয় অসভ্য মানুষ তাদের প্রজা হলো। কেবল উত্তর ভাগে বনজঙ্গলে বর্ব্বর জাতিরা স্বাধীন রইল। কাল-বশে রোম ঐশ্বর্য্যবিলাস-পরতায় দুর্ব্বল হতে লাগ্‌লো; সেই সময় আবার জম্বুদ্বীপ অসুরবাহিনী ইউরোপের উপর নিক্ষেপ করলে। অসুর তাড়নায় উত্তর-ইউ-রোপী বর্ব্বর রোমসাম্রাজ্যের উপর পড়লো! রোম উৎসন্ন হয়ে গেল। জম্বুদ্বীপের তাড়ায়, ইউরোপের

বর্ব্বর আর ইউরোপের ধ্বংসাবশিষ্ট রোমক গ্রীক মিলে এক অভিনব জাতির সৃষ্টি হলো; এ সময় য়াহুদীজাতি রোমের দ্বারা বিজিত ও বিতাড়িত হয়ে, ইয়ুরোপময় ছড়িয়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে তাদের নূতন ধর্ম্ম কৃশ্চানীও ছড়িয়ে পড়লো। এই সকল বিভিন্ন জাত, মত, পথ, নানাপ্রকারের অসুরকুল, মহামায়ার মুচিতে, দিবারাত্র যুদ্ধ, মারকাটের আগুনে, গলে মিশতে লাগলো; তা হতেই এই ইয়ুরোপী জাতের সৃষ্টি।

হিঁদুর কাল রঙ্গ থেকে, উত্তরে দুধের মত সাদা রঙ্গ, কাল কটা লাল বা সাদা চুল, কাল চোখ, কটা চোখ, নীল চোখ, দিব্যি হিঁদুর মত নাক মুখ চোখ, বা ঝাঁতা-মুখো চীনে রাম, এই সকল আকৃতি বিশিষ্ট এক বর্ব্বর, অতি বর্ব্বর ইউরোপী জাতির সৃষ্টি হয়ে গেল। কিছুকাল তারা আপনা আপনি মার কাট কর্‌তে লাগ্‌লো; উত্তরের গুলো বম্বেটে রূপে বাগে পেলেই অপেক্ষাকৃত সভ্যগুলোর উৎসাদন কর্‌তে লাগ্‌লো। মাঝখান থেকে, কৃশ্চান ধর্ম্মের দুই গুরু, ইতালীর পোপ্ (ফরাসী, ইতালী ভাষায় বলে পাপ,) আর পশ্চিমে কনষ্টান্টিনোপলসের

পাট্রিয়ার্ক, এরা এই জন্তু-প্রায় বর্ব্বরবাহিনীর উপর, তাদের রাজা রাণী সকলের উপর কর্ত্তার্ত্তি চালাতে লাগ্‌লো।

এদিকে আবার আরব মরুভূমে মুসলমানি ধর্ম্মের উদয় হলো, বন্যপশুপ্রায় আরব এক মহাপুরুষের প্রেরণাবলে অদম্য তেজে, অনাহত বলে, পৃথিবীর উপর আঘাত কর্‌লে। পশ্চিম পূর্ব্ব দু প্রান্ত হতে সে তরঙ্গ ইউরোপে প্রবেশ কর্‌লে। সে স্রোত-মুখে ভারত ও প্রাচীন গ্রীসের বিদ্যাবুদ্ধি ইয়ুরোপে প্রবেশ কর্‌তে লাগ্‌লো।

মুসলমান ধর্ম্ম।

জম্বুদ্বীপের মাঝখান হতে সেলমুল তাতার নামক অসুর জাতি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, আসিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থান দখল করে ফেল্‌লে। আরাবরা ভারতবর্ষ জয়ের অনেক চেষ্টা করেও সফল হয় নাই। মুসলমান অভ্যুদয় সমস্ত পৃথিবী বিজয় করেও ভারতবর্ষের কাছে কুণ্ঠিত হয়ে গেল। সিন্ধুদেশ একবার আক্রমণ করেছিল মাত্র, কিন্তু রাখ্‌তে পারেনি; তার পর থেকে আর উদ্যম করে নাই।

মুসলমানের ভারতাদি বিজয়।

কয়েক শতাব্দীর পর যখন তুর্ক প্রভৃতি তাতার জাতি বৌদ্ধধর্ম্ম ছেড়ে মুসলমান হলো, তখন এই

তুর্কিরা সমভাবে হিন্দু, পার্শী, আরাব, সকলকে দাস করে ফেল্‌লে। ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমান বিজেতার মধ্যে একদলও আরবি বা পার্শী নয়, সব তুর্কাদি তাতার। রাজপুতনায় সমস্ত আগন্তুক মুসলমানের নাম তুর্ক—তাই সত্য, ঐতিহাসিক। রাজপুতনার চারণ যে গাইলেন, "তুরুগণকো বঢ়ি জোর," তাই ঠিক। কুতুব উদ্দীন হতে মোগল বাদসাই পর্য্যন্ত, ও সব তাতার; যে জাত তিব্বতী, সেই জাত; কেবল হয়েছেন মুসলমান, আর হিঁদু পারসী বে করে বদ্‌লেছেন, চাকামুখ। ও সেই প্রাচীন অসুর বংশ। আজও কাবুল, পারস্য, আরব্য, কন্‌ষ্টান্টি-নোপলে সিংহাসনে বসে রাজত্ব কর্‌ছেন, সেই অসুর তাতার; গান্ধারি, ফারসি, আরাব সেই তুরুষ্কের গোলামী কচ্ছেন। বিরাট্ চীন সাম্রাজ্যও সেই তাতার মাঞ্চুর পদতলে, তবে সে মাঞ্চু নিজের ধর্ম্ম ছাড়েনি, মুসলমান হয়নি, মহালামার চেলা। এ অসুর জাত কস্মিন্ কালে বিদ্যাবুদ্ধির চর্চ্চা করে না, জানে মাত্র লড়াই। ও রক্ত না মিশ্‌লে, যুদ্ধবীর্য্য বড় হয় না। উত্তর ইয়ুরোপ, বিশেষ রুষের প্রবল যুদ্ধবীর্য্য সেই তাতার। রুষ তিন হিস্যে তাতার রক্ত।

দেবাসুরের লড়াই এখনও চল্‌বে অনেক কাল। দেবতা অসুর কন্যা বে করে, অসুর দেবকন্যা ছিনিয়ে নেয়,—এই রকম করে প্রবল খিচুড়ী জাতের সৃষ্টি হয়।

তাতাররা আরবি খলিফার সিংহাসন কেড়ে নিলে, কৃশ্চানদের মহাতীর্থ জিরুসালম্ প্রভৃতি স্থান দখল করে কৃশ্চানদের তীর্থযাত্রা বন্ধ করে দিলে, অনেক কৃশ্চান মেরে ফেল্‌লে। কৃশ্চান ধর্ম্মের গুরুরা ক্ষেপে উঠলো; ইউরোপময় তাদের সব বর্ব্বর চেলা; রাজা প্রজাকে ক্ষেপিয়ে তুল্‌লে,—পালে পালে ইউরোপী বর্ব্বর জিরুসালম্ উদ্ধারের জন্য আসিয়া মাইনরে চল্‌লো। কতক নিজেরাই কাটা-কাটি করে মলো, কতক রোগে মলো, বাকি মুসল্-মানে মার্‌তে লাগ্‌লো। সে ঘোর বর্ব্বর ক্ষেপে উঠেছে,—মুসলমানেরা যত মারে, তত আসে। সে বুনোর গোঁ। আপনাদের দলকেই লুঠছে, খাবার না পেলে মুসলমান ধরেই খেয়ে ফেল্‌লে। ইংরেজ রাজা রিচার্ড মুসলমান মাংসে বিশেষ খুসি ছিলেন, প্রসিদ্ধ আছে।

খ্রীষ্টান মুসলমান দ্বন্দ্ব।

বুনো মানুষ, আর সভ্য মানুষের লড়ায়ে যা হয়,

ফলে ইউরোপে সভ্যতার প্রবেশ।

তাই হল,—জিরুসালম্ প্রভৃতি অধিকার করা হলো না। কিন্তু ইউরোপ সভ্য হতে লাগলো। সে চামড়া পরা, আম-মাংস-খেকো বুনো, ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মান্ প্রভৃতি এসিয়ার সভ্যতা শিখ্‌তে লাগ্‌লো; ইতালি প্রভৃতি স্থানের নাগা ফৌজ দার্শনিক মত শিখ্‌তে লাগলো; একদল কৃশ্চান নাগা (Knights-templars) ঘোর অদ্বৈত বেদান্তী হয়ে উঠলো, শেষ তারা কৃশ্চানীকে ঠাট্টা করতে লাগ্‌লো; এবং তাদের ধনও অনেক সংগৃহীত হয়েছিল; তখন পোপের হুকুমে, ধর্ম্মরক্ষার ভানে, ইউরোপী রাজারা তাদের নিপাত করে ধন লুটে নিলে।

এদিকে মুর নামক মুসলমান জাতি স্পান দেশে অতি সুসভ্য রাজ্য স্থাপন কর্‌লে, নানাবিদ্যার চর্চ্চা কর্‌লে, ইউরোপে প্রথম ইউনিভার্সিটী হলো; ইতালি, ফ্রান্স, সুদূর ইংলণ্ড হতে বিদ্যার্থী বিদ্যা শিখ্‌তে এলো; রাজা রাজড়ার ছেলেরা যুদ্ধবিদ্যা, আচার, কায়দা, সভ্যতা শিখ্‌তে এলো। বাড়ি ঘর দোর মন্দির সব নূতন ঢঙ্গে বন্‌তে লাগ্‌লো।

কিন্তু সমগ্র ইউরোপ হয়ে দাঁড়াল এক মহা সেনানিবাস—সে ভাব এখনও। মুসলমানেরা একটা দেশ

জয় করে, রাজা আপনার এক বড় টুকরা রেখে, বাকি সেনাপতিদের বেঁটে দিতেন। তারা খাজানা দিত না, কিন্তু রাজার আবশ্যক হলেই এতগুলি সৈন্য দিতে হবে। এই রকমে সদা প্রস্তুত ফৌজের অনেক হাঙ্গামা না রেখে, আবশ্যক কালে হাজির প্রবল ফৌজ প্রস্তুত রইল। আজও রাজপুতনায় সে ভাব কতক আছে ;—ওটা মুসলমানেরা এদেশে আনে। ইয়ুরোপীরা মুসলমানের এ ভাব নিলে। কিন্তু মুসলমানদের ছিল রাজা, সামন্তচক্র, ফৌজ ও বাকি প্রজা। ইউরোপে রাজা, সামন্তচক্র আর বাকি সব প্রজাকে করে ফেল্‌লে এক রকম গোলাম। প্রত্যেক মানুষ কোনও সামন্তের অধিকৃত মানুষ হয়ে, তবে জীবিত রইল—হুকুম মাত্রেই প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধযাত্রায় হাজির হতে হবে।

ইউরোপের এক মহা সেনানিবাসে পরিণতি।

ইউরোপী সভ্যতা নামক বস্ত্রের এই সব হলো উপকরণ। এর তাঁত হচ্ছে—এক নাতিশীতোষ্ণ পাহাড়ি সমুদ্রতটময় প্রদেশ; এর তুলো হচ্ছে—সর্ব্বদা যুদ্ধপ্রিয়, বলিষ্ঠ, নানাজাতের মিশ্রণে এক মহা খিচুড়ী জাত। এর টানা হচ্ছে—যুদ্ধ; আত্মরক্ষার জন্য, ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ। যে তলওয়ার

ইউরোপী সভ্যতা বস্ত্রের উপাদান।

চালাতে পারে, সে হয় বড় ; যে তলওয়ার না ধরতে পারে, সে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে, কোনও বীরের তলওয়ারের ছায়ায় বাস করে, জীবন ধারণ করে। এর পোড়েন—বাণিজ্য। এ সভ্যতার উপায় তলওয়ার, সহায় বীরত্ব, উদ্দেশ্য ইহ-পারলৌকিক ভোগ।

আমাদের কথাটা কি? আর্য্যরা শান্তিপ্রিয়, চাষবাস করে, শস্যাদি উৎপন্ন করে, শান্তিতে স্ত্রী পরিবার পালন কর্‌তে পেলেই খুসী। তাতে হাঁপ ছাড়বার অবকাশ যথেষ্ট ; কাযেই চিন্তাশীলতার, সভ্য হবার অবকাশ অধিক। আমাদের জনক রাজা স্বহস্তে লাঙ্গল চালাচ্ছেন এবং সে কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মবিৎও তিনি। ঋষি, মুনি, যোগীর অভ্যুদয়—গোড়া থেকে ; তাঁরা প্রথম হতেই জেনেছেন যে, সংসারটা ধোঁকা, লড়াই কর, আর লুঠই কর ; ভোগ বলে যা খুঁজছ, তা আছে শান্তিতে, শান্তি আছেন শারীরিক ভোগ বিসর্জ্জনে ; ভোগ আছে মনঃ-শীলতায়, বুদ্ধিচর্চ্চায়, শরীর চর্চ্চায় নাই। জঙ্গল আবাদ করা তাঁদের কায।

আমাদের সভ্যতা শান্তিপ্রিয়।

তার পর, প্রথমে সে পরিষ্কৃত ভূমিতে নির্ম্মিত হল যজ্ঞবেদী, উঠলো—সে নির্ম্মল আকাশে যজ্ঞের

ধূম সে বায়ুতে বেদমন্ত্র প্রতিধ্বনিত হতে লাগ্‌লো, গবাদি পশু নিঃশঙ্কে চরতে লাগলো। বিদ্যা ধর্ম্মের পায়ের নীচে, তলওয়ার রইল। তার একমাত্র কায ধর্ম্মরক্ষা করা, মানুষ ও গবাদি পশুর পরিত্রাণ করা; বীরের নাম আপত্রাতা, ক্ষত্রিয়।

লাঙ্গল, তলওয়ার সকলের অধিপতি রক্ষক রইলেন ধর্ম্ম। তিনি রাজার রাজা, জগৎ নিদ্রিত হলেও তিনি সদা জাগরূক। ধর্ম্মের আশ্রয়ে সকলে রইল স্বাধীন।

আর্য্যগণ কর্ত্তৃক ভারতীয় আদিম জাতি বিনাশ ইউরোপীয়দের ভিত্তিহীন অনুমান মাত্র।

ঐ যে ইয়ুরোপী পণ্ডিত বল্‌ছেন যে, আর্য্যেরা কোথা হতে উড়ে এসে ভারতের বুনোদের মেরে কেটে জমী ছিনিয়ে নিয়ে বাস কর্‌লেন, ও সব আহাম্মকের কথা। আমাদের পণ্ডিতরাও দেখছি সে গোঁয়ে গোঁ—আবার ঐ সব বিরূপ মিথ্যা ছেলে-পুলেদের শিখান হচ্ছে। এ অতি অন্যায়।

আমি মূর্খ মানুষ, যা বুঝি তাই নিয়েই এ পারিস সভায় বিশেষ প্রতিবাদ করেছি। এদেশী এবং স্বদেশী পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। সময় পেলে আরও সংশয় ওঠাবার আশা আছে। এ কথা তোমাদেরও বলি— তোমরা পণ্ডিত মনিষ্যি, পুঁথি পাতড়া খুঁজে দেখ।

ইউরোপীরা যে দেশে বাগ পান, আদিম মানুষকে নাশ করে নিজেরা সুখে বাস করেন, অতএব আর্য্যেরাও তাই করেছে!! ওরা হা-ঘরে, হা অন্ন হা অন্ন করে, কাকে লুঠবে মারবে বলে ঘুরে বেড়ায়—আর্য্যরাও তাই করেছে!! বলি এর প্রমাণটা কোথায়—আন্দাজ? ঘরে তোমার আন্দাজ রাখগে।

কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে, কোথায় দেখ্‌ছ যে, আর্য্যেরা কোন্ বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন? খামকা আহাম্মকির দরকারটা কি? আর রামায়ণ পড়া ত হয় নি,—খামকা এক বৃহৎ গল্প রামায়ণের উপর কেন বানাচ্ছ?

রামায়ণ আর্য্য জাতি কর্ত্তৃক অনার্য্য বিজয়ের উপাখ্যান নহে।

রামায়ণ কি না আর্য্যদের দক্ষিণি বুনো বিজয়!! বটে—রামচন্দ্র আর্য্য রাজা সুসভ্য, লড়ছেন কার সঙ্গে? লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী ছিল বরং, কম ত নয়ই। তার পর বানরাদি দক্ষিণি লোক বিজিত হলো কোথায়?

তারা হলো সব শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র। কোন্ গুহকের, কোন্ বালির রাজ্য, রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন—তা বল না ?

হতে পারে দু এক যায়গায় আর্য্য আর বুনোদের যুদ্ধ হয়েছে, হতে পারে দু একটা ধূর্ত্ত মুনি রাক্ষসদের জঙ্গলের মধ্যে ধূনি জ্বালিয়ে বসেছিল। মটকা মেরে চোখ বুজিয়ে বসেছে, কখন রাক্ষসে ঢিল ঢেলা হাড় গোড় ছোঁড়ে। যেমন হাড়গোড় ফেলা, অমনি নাকি কান্না ধরে রাজাদের কাছে গমন। রাজা লোহার জামা পরা, লোহার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়া চড়ে এলেন ; বুনো হাড় পাথর ঠেঙ্গা নিয়ে কতক্ষণ লড়বে ? রাজারা মেরে ধরে চলে গেল। এ হতে পারে ; কিন্তু এতেও বুনোদের জঙ্গল কেড়ে নিয়েছে, কোথায় পাচ্ছ ?

অতি বিশাল নদ নদী পূর্ণ, উষ্ণপ্রধান, সমতল ক্ষেত্র—আর্য্যসভ্যতার তাঁত। আর্য্যপ্রধান, নানা-প্রকার সুসভ্য, অর্দ্ধসভ্য, অসভ্য মানুষ—এ বস্ত্রের তুলো ; এর টানা হচ্ছে—বর্ণাশ্রমাচার। এর পোড়েন—প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ নিবারণ।

তুমি ইউরোপী, কোন্ দেশকে কবে ভাল করেছ ?

উপসংহার।

অপেক্ষাকৃত অবনত জাতিকে তোলবার তোমার শক্তি কোথায়? যেখানে দুর্ব্বল জাতি পেয়েছ, তাদের সমূলে উৎসাদন করেছ; তাদের জমীতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের আমেরিকার ইতিহাস কি? তোমাদের অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, পাসিফিক্ দ্বীপপুঞ্জ, তোমাদের আফ্রিকা?

কোথা সে সকল বুনো জাত আজ? একেবারে নিপাত, বন্য পশুবৎ তাদের তোমরা মেরে ফেলেছ;— যেখানে তোমাদের শক্তি নাই, সেথা মাত্র অন্য জাত জীবিত।

আর ভারতবর্ষ তা কস্মিন্ কালেও করেন নাই। আর্য্যেরা অতি দয়াল ছিলেন, তাঁদের অখণ্ড সমুদ্রবৎ বিশাল হৃদয়ে, অমানব-প্রতিভা-সম্পন্ন মাথায়, ও সব আপাত-রমণীয় পাশবপ্রণালী কোনও কালেও স্থান পায় নাই। স্বদেশী আহাম্মক! যদি আর্য্যেরা বুনোদের মেরে ধরে বাস করত, তা হলে এ বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি কি হত?

ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ করে, আমরা বেঁচে থাক্‌বো। আর্য্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমা-

দের সমান করবো, আমাদের চেয়ে বড় করবো। ইউরোপের সভ্যতার উপায়—তলওয়ার; আর্য্যের উপায়—বর্ণবিভাগ। শিক্ষা, সভ্যতার তারতম্যে, সভ্যতা শিখিবার সোপান, বর্ণবিভাগ। ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্ব্বলের মৃত্যু; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্ব্বলকে রক্ষা করবার জন্য।

সম্পূর্ণ।